মে ২০২৬ ■ বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা





মাইসুরা আক্তার, পঞ্চম শ্রেণি, বিলচান্দক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরিদপুর, পাবনা



মোছা. সিদরাতুল মুনতাহা, তৃতীয় শ্রেণি, মদিনাবাগ কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড হাই স্কুল, মুগদা, ঢাকা

সম্পাদকীয়

তীব্র গরমের মধ্য দিয়ে শুরু হলো মে মাস। বৈশাখের মাঝামাঝি বাজারে অনেক গ্রীষ্মকালীন ফল পাওয়া যায়। আম, জাম, কাঁঠাল লিচু, আনারস, বেল ইত্যাদি ফল আমাদের বছরের পুষ্টি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মে মাসের প্রথম দিন পালিত হয় মে দিবস। ১লা মে আমাদের শ্রমজীবী মানুষদের শ্রদ্ধা করতে শেখায়। তাঁদের শ্রমের বিনিময়ে আমাদের প্রতিদিনের বিভিন্ন কাজ সহজ হয়, তাঁরা আমাদের সব সময় সাহায্য করেন। আমরা বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।

মাকে ভালোবেসে প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার বিশ্বব্যাপী পালিত হয় 'বিশ্ব মা দিবস'। মা শিশুর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। মা দিবস শুধু একদিনের নয়, প্রতিদিনের। আমরা মায়ের কথা শুনব, মায়ের যত্ন নেব, মাকে ঘরের কাজে সাহায্য করব।

এই সময় কালবৈশাখি ঝড় ও বজ্রপাত হয়ে থাকে। আমরা নিজেকে, পরিবার ও বন্ধুদের নিরাপদ রাখতে সচেতন থাকব।

ভালো থেকো বন্ধুরা, নবারুণের সাথেই থেকো।

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
চৌধুরী সাহেলা পারভীন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
☎ ০২-৮৩০০৬৮৮
editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
☎ ০২-৮৩০০৭০২

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য: ২০.০০ টাকা।



সূচি

নিবন্ধ

১৮ ছড়া, কবিতা ও গানে মা/ জোবায়ের হোসেন
২২ মায়ের তুলনা নেই/ সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম
২৪ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দিন/ সুমন প্রামাণিক
৩০ মাকে মনে পড়ে/ মুস্তাফা মাসুদ
৩৩ প্রাণের প্রদীপ/ আলিম রহমান শুভ
৩৯ প্রাণিজগতের মা/ ইভা ফারহানা
৪২ মায়ের যত ত্যাগ/ ইসমত আরা
৪৩ মাকে নিয়ে উক্তি/ রায়হান সাইফুর চৌধুরী
৪৬ মে দিবসে শেখা নতুন পাঠ
মিজানুর রহমান মিথুন
৫৬ পৃথিবীর শেষ রাস্তা/ আল ওয়াসিয়া শহীদ
৫৮ এআইতে আগামীর পথ/ হুসাইন মামুন

গল্প

২০ মায়ের অভিমান/ মোকাদ্দেস আলী
২৬ মা-পাখি আর তিনটি ছানা/ এস আই সানী
৪৯ ভূমিকম্পের তিন সেকেন্ড আগে
তানভীর হোসেন
৫১ গরু গবেষক গুলজার মামা/ জুয়েল আশরাফ

কবিতাগুচ্ছ

০৩ কাজী কাদের নেওয়াজ
৩২ হাফিজ মুহাম্মদ/ ফরিদ সাইদ
৬২ মো. রনি আহমেদ/ মো. আব্দুল কুদ্দুছ

প্রতিবেদন

৫৫ বিভিন্ন ভাষায় মা/ আনিকা তাবাস্‌সুম
৬১ 'মা' দিয়ে দেশের প্রথম শহিদমিনার
গোলাম রহমান
৬৩ বাবর আলীর মাকালু জয়/ কামরুন নাহার কনা

মাকে নিয়ে ছোটোদের লেখা

০৪ মায়ের ভালোবাসা/ তুরাগ জামান
০৫ আমার মা/ ফারিয়া তাবাসসুম (সুপ্তা)
০৬ আমার আম্মু/ শান্না খন্দকার
০৭ মায়ের মুখের হাসি/ জাকিয়া জাবিন
০৮ মায়ের কাছে খোলা চিঠি/ ফারহান লাবিব মিহির
১০ মায়ের অন্তহীন ভালোবাসা
মানতাকা তাবাসসুম পৃথিবী
১২ আমার আকাশ জুড়ে মা/ আয়ান হক ভূঁঞা
১৩ মা/ সপ্রতিভ কর্মকার আদৃত
১৪ মায়ের কাছে চিঠি/ ওয়াহিদ মুস্তাফা

ছোটোদের ছড়া

১৫ শ্রেয়সী মন্ডল/ রেজুয়ান হাসান রিফাত
১৬ শৈলী বড়ুয়া/ মো. নাজিম উদ্দিন
তানভির আহমেদ
১৭ আতিক আব্দুল্লাহ আরাফ
মালিহা আক্তার তিশা/ মো. আদিফ খান
২৩ জাহাঙ্গীর আলম/ মো. নজরুল ইসলাম
৪৫ তৌফিক ইলাহী সাব্বির
লোকমান হোসেন শিফাত/ রাহাত হোসেন রিগান

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : মাইসুরা আক্তার
মোছা. সিদরাতুল মুনতাহা
তৃতীয় প্রচ্ছদ : আলীশা আমরীন ইসলাম
রুতবাহ জামান
৬৪ মো. আবিদ/ শিফা আক্তার

নবারুণ পত্রিকা পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে

Nobarun Potrika

www.dfp.gov.bd



মা

কাজী কাদের নেওয়াজ

মা কথাটি ছোট্ট অতি
কিন্তু জেনো ভাই,
ইহার চেয়ে নাম যে মধুর
তিন ভুবনে নাই।

সত্য-ন্যায়ের ধর্ম থাকুক
মাথার 'পরে আজি,
অন্তরে মা থাকুন মম
ঝরুক স্নেহরাজি।

রোগ বিছানায় শুয়ে শুয়ে
যন্ত্রণাতে মরি,
সান্ত্বনা পাই মায়ের মধু
নামটি হৃদে স্মরি।

বিদেশ গেলে ওই মধু নাম
জপ করি অন্তরে,
মন যে কেমন করে আমার
প্রাণ যে কেমন করে।

মা যে আমার ঘুম পাড়াতো
দোলনা ঠেলে ঠেলে
শীতল হতো প্রাণটা, মায়ের
হাতটা বুকে পেলে।

[সংকলিত]



মায়ের ভালোবাসা

তুরাগ জামান

রাহাত ছিল খুব চঞ্চল একটি ছেলে। সারাদিন বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা আর দুষ্টুমি করেই তার সময় কাটত। কিন্তু পড়াশোনার প্রতি তার একদম মন ছিল না। মা প্রতিদিন তাকে ভালো করে পড়তে বলতেন, কিন্তু রাহাত মায়ের কথা শুনত না।

একদিন স্কুলে পরীক্ষা হলো। রাহাত পরীক্ষায় খুব খারাপ করল। শিক্ষক তাকে বকাও দিলেন। মন খারাপ করে সে বাড়ি ফিরল। সে ভাবছিল, মা হয়ত আজ খুব রাগ করবেন। কিন্তু বাড়িতে ফিরে সে দেখল, মা তার জন্য পছন্দের খাবার রান্না করে অপেক্ষা করছেন।

মা মৃদু হেসে বললেন,

মন খারাপ করো না বাবা। খারাপ ফল করলে কষ্ট পেতে হয়, কিন্তু চেষ্টা করলে অবশ্যই ভালো করা যায়।

রাহাত অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। সে ভাবছিল, এত ভুল করার পরও মা তাকে কত ভালোবাসেন! সেদিন রাতে মা তাকে পাশে বসিয়ে আদর করে পড়া বুঝিয়ে দিলেন।

এরপর থেকে রাহাত মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করল। কয়েক মাস পর পরীক্ষায় সে ক্লাসে প্রথম হলো। শিক্ষক তার প্রশংসা করলেন। বাড়ি ফিরে রাহাত মায়ের হাত ধরে বলল,

- মা, তোমার জন্যই আমি ভালো করতে পেরেছি।

মায়ের চোখ আনন্দে ভিজে উঠল। তিনি শুধু বললেন,

- সন্তানের সফলতাই মায়ের সবচেয়ে বড়ো সুখ।

সেদিন রাহাত বুঝতে পারল, পৃথিবীতে মায়ের ভালোবাসার মতো নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর কিছুতেই নেই। ❑

অষ্টম শ্রেণি, হাজি মুহাম্মদ মহসিন সরকারি হাই স্কুল, রাজশাহী

আমার মা

ফারিয়া তাবাসসুম (সুপ্তা)



আমি ফারিয়া তাবাসসুম (সুপ্তা)। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি। আমার মা একজন শিক্ষিকা। আমরা চার ভাইবোন। মায়ের শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে প্রতিদিন স্কুলে দিয়ে এসে মা তার কর্মস্থলে যান। আবার স্কুল ছুটির পর নিয়ে যান।

আমরা চার ভাইবোন ঠিকই কিন্তু আমার সামনে কেউ তা বলতে পারত না। আমার কাছে আমিই আমার মায়ের একমাত্র মেয়ে। আমার জন্মের ৬ মাস পর থেকেই আমি মায়ের সাথে স্কুলে যাতায়াত করি। আমার বয়স তখন প্রায় পাঁচ বছর। একদিন আম্মুর স্কুলের এক কলিগ আসেন। ওই স্যার আম্মুকে জিজ্ঞেস করেন ম্যাডাম আপনার ছেলে-মেয়ে কয়জন?

আম্মু বলেন চারজন। আমি সাথে সাথে অফিসে আম্মুর টেবিলের সব বই-খাতা ফেলে দিলাম। সবাই অবাক হয়ে বিষয়টি জানতে চাইল, আম্মু বললেন, চার ভাইবোন বলেছি তাই। স্যাররা সবাই হেসে বললেন, তাই তো! ম্যাডামের মেয়ে শুধু একজন। আর সে হলো সুপ্তা মণি। আমার আম্মু আমাকে বুকে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ গো মামণি, আমার মেয়ে তো শুধু তুমি। আমি তো ভুলেই গিয়েছি আমার যে শুধু একটা মেয়ে।

সেদিনের ঘটনা আমার কাছে স্মৃতি হয়ে রইল। আজও আমার সামনে কেউ বলতে পারে না, আমরা চার ভাইবোন। আমিই আমার মায়ের একমাত্র মেয়ে। আমার মা পৃথিবীর সেরা মা।

ভালোবাসি তোমাকে খুব মা। ❑

সপ্তম শ্রেণি, বড় মহেশখালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার

আমার আম্মু

শান্না খন্দকার

আমার আম্মু নিউরোসাইন্সে চাকরি করে। আমার আম্মু আমাকে অনেক পছন্দ করে। আম্মু আমাকে সবকিছু কিনে দেয়। আম্মু আমাদের অনেক ভালোবাসে। আম্মু অনেক ভালো। আম্মু আমাদেরকে স্কুল থেকে নিয়ে আসে। আম্মু আমাদেরকে চকলেট কিনে দেয়। আম্মু আমাদেরকে কোকাকোলা কিনে দেয়। আম্মু আমাদেরকে পড়াশোনা শিখায়। আম্মু আমাদের সবচেয়ে ভালো বন্ধু।

কেজি শ্রেণি, বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

বাংলাদেশ
পোস্টকার্ড
BANGLADESH

৳10.00 ৳10.00

নাম আম্মু

ঠিকানা ই-১৯, বসুপাড়া, দারুসসালাম

ডাকঘর মিরপুর

জেলা ঢাকা

পোস্ট কোড নম্বর			
১	২	১	৬

মায়ের মুখের হাসি



জাকিয়া জাবিন

মা আমাকে প্রায়ই বকা দেন। সকালে দেরি করে ঘুম থেকে উঠলে বকা দেন, বই-খাতা এলোমেলো রাখলে বকা দেন। তখন আমার খুব রাগ হয়। মনে হয়, মা শুধু আমাকেই বকেন। কিন্তু একটু পরেই মা এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তখন আর রাগ করে থাকতে পারি না।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখি মা খুব চিন্তায় আছেন। মা তাঁর মোবাইল খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পুরো বাসা খুঁজেও পাচ্ছিলেন না। পরে দেখি, মোবাইলটা মায়ের হাতেই ছিল। আমি হেসে ফেললাম। মা-ও পরে হেসে বললেন, 'আমি না দিন দিন খুব ভুলোমনা হয়ে যাচ্ছি!'

আমার মা আইসক্রিম খুব পছন্দ করেন। কিন্তু নিজের জন্য কখনো কিনেন না। আমি আর আপি আইসক্রিম খেলে মা শুধু একটু খেয়ে বলেন, 'তোরা খা, আমার লাগবে না।' অথচ আমি জানি, মায়েরও খেতে ইচ্ছে করে। গত মাসে মায়ের জন্মদিন ছিল। মা নিজেই ভুলে গিয়েছিলেন। আমি, বাবা আর আপি ঠিক করলাম, মাকে একটা সারপ্রাইজ দেবো। আপি কেক আনবে, বাবা ফুল আনবেন। আর আমি মায়ের জন্য একটা ছোট্ট উপহার কিনব।

বিকেলে আমি দোকানে গেলাম। অনেক কিছু দেখলাম। পুতুল, চুড়ি, ব্যাগ- সবই সুন্দর লাগছিল। পরে একটা নীল রঙের কাপ দেখলাম। কাপটার গায়ে লেখা ছিল, Best Mom। এটা আমার খুব ভালো লাগল। আমি সেটাই কিনে বাসায় নিয়ে এলাম। রাতে মা ছাদে ছিলেন। বাবা গল্প করে মাকে সেখানে আটকে রাখলেন। আমি আর আপি তাড়াতাড়ি ঘর সাজালাম। দেয়ালে কাগজ দিয়ে লিখলাম, HAPPY BIRTHDAY MA। সব সাজানো শেষ হলে বাবা মাকে নিয়ে এলেন।

মা ঘরে ঢুকে সব দেখে একদম অবাক। তারপর হাসতে লাগলেন। আমরা সবাই মিলে কেক কাটলাম। মা খুব খুশি হলেন। আপির দেওয়া ফুল হাতে নিয়ে বললেন, 'অনেক সুন্দর!' বাবার দেওয়া শাড়িটাও মায়ের খুব পছন্দ হলো। শেষে আমি আমার উপহারটা দিলাম। মা কাপটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ দেখলেন। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এটাই আমার সবচেয়ে সুন্দর উপহার।' সেদিন আমি বুঝলাম, মায়েরা আসলে খুব অল্পতেই খুশি হন। শুধু একটু ভালোবাসলেই হয়। ❑

চতুর্থ শ্রেণি, রাবেয়া ইসলাম আদর্শ বিদ্যালয়, মেলান্দহ, জামালপুর



মায়ের কাছে খোলা চিঠি

ফারহান লাবিব মিহির

প্রিয় আম্মু,

আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। আমার কাছে মনে হয় তুমি পৃথিবীর সবার থেকে সেরা আম্মু। আমার মনের সব ইচ্ছে তোমাকে না বললেও তুমি সেটা বুঝতে পারো। প্রতিদিন বিকেলে মাদ্রাসা থেকে যখন বাসায় আসি তখন আমি দূর থেকে তাকিয়ে দেখি তুমি বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আছো আমার অপেক্ষায়।

তখন আমার মনটা খুশিতে ভরে যায়।

বাসায় এসে দেখি আমার পছন্দের সব খাবার তুমি রান্না করে রেখেছো। যতটুকু সময় বাসায় থাকি তুমি আমার পাশেই বসে থাকো, অন্য কাজে যাও না। তোমার কি মনে আছে আম্মু, তোমার একবার খুব জ্বর হয়েছিল, হাসপাতালে ভর্তি ছিলে। যাবার আগে তুমি বলেছিলে ঠিকমতো খাবার খাবে কিন্তু মাদ্রাসা থেকে কোথাও বের হবে না। তোমার চোখে পানি টলমল করছিল তবুও তুমি আমার সামনে চোখের পানি আটকে রেখেছিলে, কারণ আমি যেন তোমার চোখের পানি দেখে কষ্ট না পাই। আব্বু আমাকে বলেছিল, তোমার আম্মু শুধু তোমার কথাই বলছে যে, আমার বাবা কী খাচ্ছে মাদ্রাসায়। কারণ তুমি জানো আমি খাবারের বিষয় নিয়ে অন্য সবার থেকে আলাদা।

তুমি হাসপাতালে ছয়টা দিন ছিলে। ওই ছয়টা দিনে আমি বুঝতে পেরেছি মায়ের ভালোবাসা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ভালোবাসা। মা ছাড়া পৃথিবী অন্ধকার। ওই ছয়টা দিন আমি প্রায় সময় না খেয়ে থেকেছি, অল্প কিছু খেয়েছি। মাদ্রাসার তরকারি তো আমি খেতে পারি না। তোমার হাতের রান্না তরকারি দিয়ে আমি তৃপ্তি করে ভাত খাই। আম্মু জানো, ওই ছয়টা দিনে আমি তোমার জন্য নামাজ পড়ে অনেক দোয়া করেছি, আল্লাহর কাছে কেঁদেছি, আল্লাহ আপনি আমার আম্মুকে সুস্থ করে দিন। এই কথাগুলো তোমাকে কখনোই বলা হয়নি। তাই আজকে মা দিবসে তোমাকে একটা খোলা চিঠি লিখলাম। তুমি আমাকে যেমন মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসো, আমিও তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি। এই পৃথিবীতে তোমার মতো আপন আমার আর

কেউ নেই। আমি যে খাবারটা পছন্দ করি সেই খাবারটা তুমি কখনোই খাও না। সেই খাবারটা বারবার আমাকে অল্প অল্প করে দাও। মাদ্রাসা থেকে তো আমাদের বাসার বেলকনি দেখা যায়। আমি জানালায় এসে দেখি তুমি মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে আমাকে দেখছ আমি কী করছি। আমার বন্ধুদের কাছে আমি গল্প করি আমার আম্মুর মতো এত আদর আমি কাউকে করতে দেখিনি। তুমি আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলে। সেই গল্পটা আমার বন্ধুদের আমি দেখিয়েছিলাম। ওরা তোমার অনেক প্রশংসা করেছিল, তখন আমারও খুব ভালো লাগছিল। আম্মু ভুলেই তো গেছি, তুমি আমার পড়া নোট করে দিয়েছিলে খাতায়। সেই খাতাটা দেখে আমার বন্ধুরা বলেছিল, তোমার আম্মু এত সুন্দর করে লেখে। আমার বন্ধুদের মুখে তোমার প্রশংসা শুনে আমার কত যে ভালো লাগছিল সেটা বলে বোঝাতে পারব না। আমার বন্ধুরা বলেছিল আমাদের আম্মুরা আমাদের এত কিছু করে দেয় না। তোমার তো ভাগ্য ভালো, তোমার আম্মু তোমাকে কত কিছু করে দেয়। আম্মু, তোমাকে আমার আম্মু হিসেবে পেয়ে আমার জীবন ধন্য। তোমার স্নেহ, আদর লেখাপড়ার প্রতি আমাকে অনুপ্রেরণা যোগায়।

আম্মু তুমি আমার জন্য অনেক দোয়া করো আমি যেন তোমার মনের আশা পূরণ করতে পারি। তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি।

আমি যেন সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে পারি, মনের অজান্তে তোমার সাথে কখনো কোনো বেয়াদবি হয়ে গেলে ক্ষমা করে দিও। আম্মু তুমি এভাবেই আমার পাশে থেকো। তোমার মুখখানা দেখলে আমার কত যে শান্তি লাগে সেটা বলে বোঝাতে পারব না।

আল্লাহ তায়ালার কাছে সব সময় দোয়া করি আল্লাহ তুমি আমার আম্মুকে সুস্থ রেখো। আম্মু ভালো থেকো সব সময়। নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিও। ঠিকমতো ওষুধ খাবে, তোমার তো ওষুধ খাওয়ার কথা মনে থাকে না। আম্মু আমি যখন মাদ্রাসায় থাকি তোমাকে সব সময় খুব মনে পড়ে। আমাকে নিয়ে তুমি কোনো চিন্তা করো না। পড়ালেখা শেষ করে আমি তোমার কাছে আবার ফিরে আসব। আম্মু তোমাকে খুব ভালোবাসি...

ইতি

তোমার একমাত্র আদরের ছেলে

মিহির

জামিয়া ইসলামিয়া বাইতুল নূর, শ্রেণি-মিযান, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা



মায়ের অন্তহীন ভালোবাসা

মানতাকা তাবাসসুম পৃথিবী

ছোটোবেলা থেকে মা আমার জন্য সবকিছু করেছেন-আমার প্রথম হাঁটা, প্রথম পড়া শেখানো, প্রথম ব্যর্থতার সময় আমার হাত ধরে দাঁড় করানো। আজও মনে পড়ে, যখন আমি স্কুলে নতুন কোনো বই হারিয়েছিলাম, সবাই আমার দিকে হাসাহাসি করছিল, মা কেবল আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, চিন্তা নেই, আমরা আবার খুঁজে নেব।

সন্ধ্যার আগে হঠাৎ আমার মন খারাপ হয়ে গেল। ক্লান্ত দেহে আমি মায়ের কাছে গিয়ে বললাম, মা, তুমি কি কখনো বিরক্ত হও? মা আমাকে কেবল কাছে টেনে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমি বিরক্ত হই, কিন্তু তোমার জন্য কখনো নয়। তোমার হাসি আমার সবচেয়ে বড়ো শান্তি।

মা যে-কোনো সময় আমাকে বুঝতে পারেন। তার নিশ্বাস, তার ছোটো ছোটো অভ্যাস, সবকিছুই আমার জীবনে সুরের মতো। কখনো কখনো ভাবি, মা ছাড়া আমি কোথায় হতাম। তার ত্যাগ, তার ভালোবাসা, তার অসীম ধৈর্য-সবকিছুই আমার জীবনের মূল স্তম্ভ।

আজও, যতবার দুঃখ বা ব্যর্থতার চাপ অনুভব করি, মা আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি শুধু আমার মা নন, তিনি আমার প্রথম বন্ধু, আমার প্রথম শিক্ষক, আমার সবকিছুর ঠিকানা। আর আমি জানি, যত বড়োই হয়ে যাই না কেন, মা হবে আমার জীবনের সেই চিরন্তন আশ্রয়, যার ছায়ায় সব দুঃখ হালকা হয়ে যায়।

ছোটোবেলায় প্রতিদিন সকালে মা আমার ছোট্ট হাতটা শক্ত করে ধরে স্কুলে নিয়ে যেতেন। রাস্তা পার হওয়ার সময় তিনি আরও শক্ত করে হাত চেপে ধরতেন, যেন পুরো পৃথিবীর সব বিপদ থেকে আমাকে আগলে রাখছেন।

আমি তখন বুঝতাম না, কেন মা বারবার বলতেন-আস্তে হাঁটো। গাড়ির দিকে খেয়াল রাখো। আমার হাত ছেড়ো না।

আজ বড়ো হয়ে বুঝি, ওই হাত ধরা শুধু রাস্তা পার করানো ছিল না; সেটা ছিল জীবনের প্রতিটি বিপদ থেকে আমাকে নিরাপদে রাখার এক নীরব যুদ্ধ।

স্কুলের গেট পর্যন্ত পৌঁছে মা হাসিমুখে বলতেন, ভয় পেও না, আমি এখানেই আছি।

কিন্তু আমি জানতাম না, আমার ভেতরে সাহস ঢেলে দিয়ে মা নিজেই সারাদিন আমার জন্য দোয়া করতেন।

একবার স্কুলে ফি দিতে গিয়ে টাকা হারিয়ে ফেলেছিলাম। টাকা হারিয়ে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। জানি মায়ের অনেক কষ্টের টাকা -এখন কী হবে?

মা সেদিন আমাকে কিছু বলেননি। শুধু রাতে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, চিন্তা করিস না, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

পরে জানতে পারলাম, সেদিন আমার স্কুলের ফি দেওয়ার জন্য মা বহু কষ্টে আবার টাকা জোগাড় করেছিলেন।

আমরা সন্তানেরা বড়ো হয়ে যাই, কিন্তু কখনো মায়ের কষ্টগুলো বড়ো হয়ে দেখি না।

মায়ের জ্বর থাকলেও রান্না বন্ধ হয় না।

মায়ের চোখে পানি থাকলেও হাসি থামে না।

মায়ের নিজের স্বপ্নগুলো এক সময় সন্তানের স্বপ্নের নিচে চাপা পড়ে যায়।

এই পৃথিবীতে অনেক ভালোবাসা আছে, কিন্তু মায়ের ভালোবাসার মতো নিঃস্বার্থ আর কিছু নেই। মানুষ বদলে যায়, সময় বদলে যায়, সম্পর্ক বদলে যায়- কিন্তু মা বদলায় না।

মা এমন এক ছায়া, যিনি নিজে রোদে পুড়ে সন্তানের জন্য ঠান্ডা হয়ে থাকেন।

মা এমন এক নদী, যিনি নিজের সবটুকু জল বিলিয়ে দিয়েও শুকিয়ে যান না।

আর মা এমন এক দোয়া, যা মানুষ হারানোর পর বুঝতে পারবে যে সে কত বড়ো আশীর্বাদ হারিয়েছে।

যখন মন খারাপ হয়, মনে হয় পৃথিবীর সব দরজা বন্ধ হয়ে গেলেও একটা দরজা খোলা থাকে-সেটা হলো 'মা'। ❑

দ্বাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান শাখা, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা



আমার আকাশ জুড়ে মা

আয়ান হক ভূঁঞা

আমার মা আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। ভোরবেলা যখন জানালা দিয়ে মিষ্টি বাতাস এসে আমার গায়ে লাগে, তখন মায়ের মিষ্টি ডাকেই আমার ঘুম ভাঙে। আমার মা সরকারি চাকরি করেন। চাকরি করার পাশাপাশি সারাদিন মা আমার জন্য কত কী যে করেন!

আমি এখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। পড়ালেখার চাপ আগের চেয়ে একটু বেড়েছে। গণিতের কঠিন কোনো অঙ্ক করতে সমস্যা হলে বা বিজ্ঞানের কোনো জটিল পড়া বুঝতে না পারলে, আমি সবার আগে মায়ের কাছে যাই। মা খুব ধৈর্য নিয়ে আমাকে পড়া বুঝিয়ে দেন। শুধু পড়াশোনাই নয়, ঘরের কাজ করা, আমাকে স্কুলের জন্য তৈরি করা, স্কুলের টিফিনে আমার পছন্দের খাবার তৈরি করে দেওয়া, আমার জামাকাপড় গুছিয়ে রাখা–সবকিছু মা একাই সামলান। মাঝে মাঝে ভাবি, মা এত শক্তি কোথায় পান! মা কখনো ক্লান্ত হন না। আবার কখনো কোনো ভুল করে ফেললে মা যে শুধু বকা দেন তা নয়, আদর করে বুঝিয়েও বলেন কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল।

অফিস থেকে ফিরে মা আমার প্রিয় নাশতা বানিয়ে দেন। সন্ধ্যায় যখন হোমওয়ার্ক করতে বসি, মা তখন আমার পাশে এসে বসেন। কোনো পড়া কঠিন লাগলে সেটা সহজ করে বুঝিয়ে দেন। পড়া শেষ হলে মা আবার আমার খেলার সাথিও হয়ে যান। আমি বড়ো হয়ে কী হব এখনো জানি না, কেউ বলে ডাক্তার, কেউ বলে ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু সবকিছুর আগে– আমি এমন একজন মানুষ হতে চাই যেন আমার মা আমার জন্য গর্ব করতে পারেন। আমি আমার মাকে খুব ভালোবাসি। ❑

ষষ্ঠ শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

মা

সপ্রতিভ কর্মকার আদৃত



রিনি ও মিনি দুই বোন। দুজনেই স্কুলে পড়ে। রিনি পড়ে সিক্স আর মিনি ফাইভে। দুজনেই মা'কে ভালোবাসে।

মাও রিনি-মিনিকে খুব ভালোবাসেন। সেই জন্য রিনি-মিনি খুব খুশি হয়। তাই মায়ের থেকেও তারা মা'কে বেশি ভালোবাসে। একদিন ছুটির দিনে মা বললেন, তোমরা কি শুধু মা'কেই ভালোবাসো? হ্যাঁ... মা'কে ছাড়া আর কাকে ভালোবাসব? রিনি-মিনি বলল। তখন মা বললেন, তোমরা যে মা'কেই ভালোবাসো তা তখনই বোঝা যাবে যখন দেশকে ভালোবাসবে। মানে? রিনি-মিনি একসাথে জিজ্ঞেস করল। মা বললেন, একটু ভেবে বোঝার চেষ্টা করো, আমার মনে হয় তাহলেই বুঝতে পারবে। রিনি-মিনি তখনই মায়ের কথামতো বুঝতে চেষ্টা করল আর বুঝেও গেল।

একদিন রিনি-মিনি দেখল যে তাদের স্কুলের পতাকা নষ্ট হয়ে গেছে। তখন তাদের আগেকার কথা মনে পড়ে গেল। ছোটোবেলায় মা বলতেন যে, পতাকা যদি নষ্ট হয়ে যায় তখন সেটা সমাধি দিতে হয়- মানে মাটির নিচে পুঁতে দিতে হয়। তারপর আবার পতাকা বানাতে হয়। সেই কথা ভেবে তারা পতাকা নিয়ে আসে। মা দেখে বললেন, ভালো কাজ করেছ- এবার এটা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। পতাকা সমাধি দেওয়ার পর মা বললেন, এখন পতাকা বানাতে হবে। তখন তারা কাগজ দিয়ে লাল-সবুজ রং করে পতাকা বানালো। পরদিন সকালে স্কুলে সেই পতাকা লাগিয়ে দিলো। এটা দেখে স্কুলের সকল শিক্ষক খুব খুশি হলেন। সবাই হাততালি দিলেন। মা'ও খুব খুশি হলেন। তখনই মা বুঝতে পারেন যে, রিনি আর মিনি দেশকে খুব ভালোবাসে। তারা-ই তার ভালোবাসার সন্তান। তারা তাঁকে খুব ভালোবাসে। রিনি-মিনিকে নিয়ে মা যা ভেবেছিলেন ওরা বড়ো হওয়ার পর মা ভাবতে বললেন যে- তারাই তো তার ভালোবাসার সন্তান। ❑

কেজি শ্রেণি, শহিদ বাবুল একাডেমি, খিলগাঁও, ঢাকা



মায়ের কাছে চিঠি

ওয়াহিদ মুস্তাফা

প্রিয় মা,

আমার সালাম নিও। আশা করি তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতি হয়েছ। ২০১৮ সালের ১৬ই আগস্ট তুমি আমাকে ও বাবাকে রেখে পরপারের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলে। এই আট বছর তুমি আমাদের কোনো খোঁজও নাওনি। আর নেবেই বা কীভাবে! তুমি তো আল্লাহর কাছে! মা! মাগো! তুমি ছিলে আমাদের দুজনের সবচেয়ে কাছের মানুষ। তোমাকে নিয়েই ছিল আমাদের দুজনের পৃথিবী। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো দুঃখের বিষয় তুমি যেদিন পরপারের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে সেদিন ছিল বাবার জন্মদিন অর্থাৎ ১৬ই আগস্ট। সেদিনের পর থেকে বাবা আজও তাঁর জন্মদিন পালন করেনি। তোমার পরপারে রওনা দেওয়ার পর থেকে আমাদের জীবন হয়ে গিয়েছিল দুঃখের। কেউ আমাদের নিতে চাইত না। এ সময় দাদা-দাদি আমাদেরকে পরম আদরে আঁকড়ে ধরেন। বিশেষ করে দাদি আজও আমাকে যেভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন, তা ভোলার

মতো নয়। আরেকজন আমার নানি। এই এত বছর প্রতিদিন ফোন করে আমার খোঁজ নিয়েছেন এবং এখনও নিচ্ছেন। আর আমার ফুফু? ফুফু হলো আমার লেখক হবার প্রেরণা।

আমার এখনো মনে পড়ে সেই কথা, যখন তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে তখন আমি তোমার সাথে খেলা করছিলাম। আমি তো তখন অনেক ছোটো ছিলাম।

যখন অবস্থা গুরুতর হতে লাগল তখন বাবা অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন দেন। অ্যাম্বুলেন্স আসার পর তোমাকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয় ও হাসপাতালের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করা হয় ও পরে ডাক্তার এসে পর্যবেক্ষণ করে তোমাকে মৃত ঘোষণা করে। তখনই আমরা সকলে শোকের সাগরে পড়ে গেলাম। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর বাবা জোরে দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। আমি তখন খালি পায়ে, আম্মুর এই অবস্থায় আমার জুতা পরার কথা মনে নেই। তারপর তোমাকে বাসায় এনে গোসল করানো হলো। গোসল শেষে জানাজার নামাজ পড়ানো হলো। নামাজ শেষে তোমাকে জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হলো। আমরা তখন একেবারে অসহায়। আমাদের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটা আর নেই, মাগো! তোমার ছোট্ট ওয়াহিদ এখন বেশ বড়ো হয়েছে। দোয়া করো আমি যেন অনেক বড়ো হতে পারি।

আমার চিঠির জবাব দিও। হাওয়ার দোলায় আমি ঠিক জবাব পেয়ে যাব।

ইতি

তোমার আদরের

ওয়াহিদ

সপ্তম শ্রেণি, বাঘারপাড়া সরকারি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর

আমার মা কে ভালোবাসি

শ্রেয়সী মন্ডল

আমার মা কে ভালোবাসি
মা-যে অনেক ভালো,
মা আমাকে দেখিয়েছে
এই পৃথিবীর আলো।

মনটা আমার খারাপ হলে
আদর করে মা,
দেখলে আমার হাসি মায়ের
কষ্ট থাকে না।

আমার কাছে সবার সেরা
শুধুই আমার মা,
মা কে ছাড়া কখনোই
ভালো লাগে না।

পঞ্চম শ্রেণি, জগদীশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঝালকাঠি

আমার মা

রেজুয়ান হাসান রিফাত

মা আমার ছোট্ট পৃথিবী
মা আমার প্রাণ
মায়ের জন্য হৃদয়জুড়ে
অফুরন্ত টান।

মায়ের মুখে হাসি দেখলে
মনটা ভরে যায়
সব দুঃখ-কষ্টের মেঘ
দূরে সরে যায়।

মায়ের স্নেহ নদীর মতো
বহে চলে অবিরাম
মায়ের আদর পেয়ে
সতেজ হয় মন-প্রাণ।

একাদশ শ্রেণি, নাসিরাবাদ কলেজ, ময়মনসিংহ

লক্ষ্মী আমার মা

শৈলী বড়ুয়া

আমি যখন লেখি -পড়ি
একলা বসে ঘরে
মামনিটা চুপি চুপি
আমায় আদর করে।

নিয়মিত পড়ালেখা
না করলে বাসায়
বাবা আমায় খুব
বকে এবং শাসায়।

মা আমার অফিস ফেরত
কত কিছু আনে
দাদা আমি ভাগ করে খাই
অনেক মজা করে।

অষ্টম শ্রেণি, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দামপাড়া, চট্টগ্রাম

মায়ের ভালোবাসা

মো. নাজিম উদ্দিন

মা আমার সকালবেলার
মিষ্টি রোদের হাসি,
মায়ের স্নেহ ছড়িয়ে আছে
আনন্দ রাশি রাশি।

মা আমার জীবনের
প্রথম পাঠশালা,
মায়ের কাছেই শিখেছি
হাত ধরে চলা।

দুঃখ এলে মা-ই আগে
বুকের মাঝে টানে,
ভয়ের দিনে সাহস জোগায়
মিষ্টি কথা আর গানে।

দশম শ্রেণি, ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, সেনানিবাস, কুমিল্লা



মায়ের মমতা

তানভির আহমেদ

ভুল করলে মা শাসন করে
মমতারই পরশে
একটু পরে আদর দিয়ে
আগলে রাখে পাশে।

মায়ের চোখে স্বপ্ন থাকে
সন্তানেরই জন্য
মায়ের ভালোবাসায়
জীবন হয় ধন্য।

মায়ের দোয়া সাথে থাকলে
ভয় কিসের আর
কঠিন পথও সহজ লাগে
খুলে যায় সকল দ্বার।

দ্বাদশ শ্রেণি, হাবিবুল্লা বাহার কলেজ, শান্তিনগর ঢাকা

আম্মু মানে

আতিক আব্দুল্লাহ আরাফ

আম্মু মানে চাঁদ-তারা ফুল
আম্মু মানে সব,
আম্মু মানে মস্ত আকাশ
পাখির কলরব।

আম্মু মানে আকাশ-বাতাস,
আম্মু মানে আলো,
আম্মু মানে এই পৃথিবী
তাকেই বাসি ভালো।

আম্মু মানে ভালোবাসা
আম্মু মানেই সুখ,
আম্মু মানে ঝরনাধারা
মেটায় সকল দুখ।

আম্মু মানে চাঁদের আলো
আম্মু মানে হাসি,
আম্মু মানে সব সমাধান
আম্মুকে ভালোবাসি।

ষষ্ঠ শ্রেণি, কামারখালী উচ্চ বিদ্যালয়, মধুখালী, ফরিদপুর

চিরঋণী

মো. আদিফ খান

জীবন জুড়ে মায়ের ঋণ
শোধ করা দায়
মায়ের চেয়ে আপন মানুষ
কোথায় খুঁজে পায়?

মাকে ভালোবেসে
রাখি হৃদয় মাঝে
মায়ের কথা মনে পড়ে
নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

একাদশ শ্রেণি, সিরাজগঞ্জ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ



মা

মালিহা আক্তার তিশা

মা তুমি নরম ভোরের
শিশিরভেজা আলো,
তোমার ছোঁয়ায় এই পৃথিবী
লাগে ভীষণ ভালো।

নিজে কষ্ট লুকিয়ে রেখে
হাসো আমার তরে,
তোমার দোয়ায় পথের আঁধার
আলো হয়ে ঝরে।

আমি যখন হারিয়ে যাই
দুঃখভেজা রাতে,
তোমার কণ্ঠ সাহস হয়ে
জড়িয়ে থাকে সাথে।

পৃথিবীতে অনেক ভালোবাসা
মিলবে ক্ষণে ক্ষণে,
মায়ের মতো নিঃস্বার্থ মন
মেলে না জীবনে।

নবম শ্রেণি, বেগম কাজী জেবুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

ছড়া, কবিতা ও গানে মা

জোবায়ের হোসেন



মা জীবনের সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে প্রিয় এবং নির্ভরতার আশ্রয়। জন্মের পর থেকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মা সন্তানের পাশে থাকেন। তাঁর স্নেহ, মমতা, ত্যাগ ও ভালোবাসা বড়ো করে তোলে। তাই সাহিত্য, কবিতা, ছড়া ও গানে মায়ের স্থান সবসময়ই বিশেষ। বাংলা সাহিত্যের অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক ও গীতিকার তাঁদের রচনায় মায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কথা প্রকাশ করেছেন।

কবিতায় মাকে দেখা যায় এক অনন্ত মমতার প্রতীক হিসেবে। বাংলা সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম মায়ের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন কবিতায়। তাঁর বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি-

> ‘মাগো, আমায় ছুটি দিতে বল,
> সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা।’

এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তির মধ্যেই ফুটে উঠেছে শিশুর মায়ের প্রতি নির্ভরতা ও আবেগ। শিশু যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন সে মায়ের কাছেই আশ্রয় খোঁজে।

বাংলা সাহিত্যের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর রচনাতেও মায়ের প্রতি গভীর মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর শিশুতোষ কবিতায় মা ও সন্তানের সম্পর্ক সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মা শুধু একজন মানুষ নন, তিনি সন্তানের আনন্দ ও স্বপ্নের জগৎ।

ছড়ায়ও মায়ের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুসাহিত্যের ছড়াগুলোতে মা কখনো গল্পকথক, কখনো স্নেহময়ী অভিভাবক, আবার কখনো শিশুর সবচেয়ে কাছের বন্ধু হিসেবে উপস্থিত হন। বাংলা ছড়ার একটি পরিচিত পঙ্‌ক্তি-

'ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি, মোদের বাড়ি এসো,
খাট নাই, পালং নাই, আসন পেতে বসো।'

এই ছড়াটি শুনলেই মনে পড়ে যায় মায়ের কণ্ঠে শোনা শৈশবের সেই মধুর ঘুমপাড়ানি গান। মা তাঁর স্নেহমাখা কণ্ঠে সন্তানের ঘুমের জন্য ছড়া ও গান শোনান। ফলে ছড়া শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি মা ও সন্তানের আবেগের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে।

বাংলা গানে মায়ের স্থান আরও উজ্জ্বল। অসংখ্য গান রচিত হয়েছে মাকে কেন্দ্র করে। এসব গানে মায়ের ত্যাগ, ভালোবাসা ও সন্তানের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম মমতার কথা বলা হয়েছে। বহুল জনপ্রিয় একটি গানের পঙ্‌ক্তি-

'মাগো, ভাবনা কেন?
আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে।'

এই গানের মাধ্যমে মায়ের প্রতি সন্তানের ভালোবাসা ও আশ্বাসের প্রকাশ ঘটেছে। মা সবসময় সন্তানের জন্য চিন্তা করেন, আর সন্তান চায় সেই চিন্তা দূর করতে। আরেকটি জনপ্রিয় গানের পঙ্‌ক্তি-

'মা গো, তোমার কোলে মাথা রেখে
ঘুমিয়ে থাকতে চাই।'

এই কথাগুলো প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের অনুভূতি। বয়স যতই বাড়ুক না কেন, মায়ের কোলের শান্তি ও নিরাপত্তার অনুভূতি কখনো মুছে যায় না।

কবিতা, ছড়া ও গানে মাকে শুধু একজন ব্যক্তিরূপে নয়, অনেক সময় মাতৃভূমির প্রতীক হিসেবেও তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের দেশকে আমরা 'মা' বলে সম্বোধন করি। দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে কবি ও গীতিকাররা মায়ের রূপক ব্যবহার করেছেন। কারণ, মা যেমন সন্তানকে আগলে রাখেন, তেমনি মাতৃভূমিও তার সন্তানদের আশ্রয় দেয়। আর মাকে নিয়ে রচিত কবিতা, ছড়া ও গান মানুষের হৃদয়ের অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে। এসব রচনায় আমরা মায়ের অসীম ভালোবাসা, ত্যাগ, মমতা ও আত্মত্যাগের চিত্র দেখতে পাই। এগুলো শুধু সাহিত্য নয়, মানুষের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন।

ছোটোবেলায় মা আমাদের প্রথম শিক্ষক। তাঁর কাছ থেকেই আমরা কথা বলতে, চলতে এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে শিখি। কবিতা, ছড়া ও গানে মাকে তাই শিক্ষার আলো ছড়ানো একজন আলোর দিশারী হিসেবেও উপস্থাপন করা হয়েছে। একজন সন্তানের চরিত্র গঠনে মায়ের অবদান সবচেয়ে বেশি। তাই সাহিত্যিকরা মাকে সমাজ গঠনের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

গানের জগতে মাকে নিয়ে লেখা গান মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। কারণ এসব গানের কথা মানুষের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায়। মা যখন পাশে থাকেন, তখন জীবন অনেক সহজ মনে হয়। আর মা যখন দূরে চলে যান, তখন তাঁর স্মৃতি মানুষকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তাই মাকে নিয়ে লেখা গান শুনলে অনেকের চোখে জল আসে।

কবিতা, ছড়া ও গানে মা চিরকালই ভালোবাসা, মমতা ও ত্যাগের প্রতীক হিসেবে স্থান পেয়েছেন। মায়ের প্রতি মানুষের যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, তা সাহিত্য ও সংগীতের মাধ্যমে যুগে যুগে প্রকাশিত হয়েছে। ভবিষ্যতেও কবি, সাহিত্যিক ও গীতিকারদের রচনায় মা একইভাবে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। কারণ পৃথিবীতে মায়ের ভালোবাসার মতো নিঃস্বার্থ ও পবিত্র ভালোবাসা আর কোনো কিছুতেই নেই। মা-ই আমাদের জীবনের প্রথম আশ্রয়, প্রথম শিক্ষক এবং চিরন্তন ভালোবাসার প্রতীক। ❑

প্রাবন্ধিক

গল্প

মায়ের অভিমান

মোকাদ্দেস আলী



স্কুল থেকে ফিরেই ব্যাগটা বারান্দায় রাখে জাবির। রেখেই এক দৌড়। এমন তাড়া যেন, ব্যাগটা ঘরে রাখারও সময় নেই। দৌড়ে মায়ের ঘরে যায় জাবির। হাতে তুলে নেয় মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোন হাতে নেওয়া মানে গেমের জগতে ঢুকে যাওয়া।

মা ডাকেন, জাবির জাবির।

আসছি মা, একটু পরে। জবাব দিয়েই মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়।

মা আবার ডাকেন, জাবির জাবির। ভাত খেয়ে নাও বাবা।

জাবিরের কোনো সাড়াশব্দ নেই।

একটু পরে মা আবার ডাকেন, জাবির জাবির।

আসছি মা। বলেই সে আবার গেম খেলায় মন দেয়।

এবার বেশ কিছুক্ষণ মায়ের কোনো সাড়াশব্দ নেই।

কিছুক্ষণ পরে মা-ই এলেন জাবিরের কাছে। বললেন, এত ডাকছি তুমি তো শুনছ না। স্কুল থেকে এসে হাতমুখও ধোওনি। ভাত খাওয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। খেতে হবে না! গেম তো পরেও খেলা যাবে।

জাবির বিরক্ত হয়ে বলে, মা, তোমার কথা সব সময় শুনি। সাথে সাথে কী সব কথাই শুনতে হবে?

এমন কথায় মায়ের পৃথিবীতে যেন কালো মেঘ জমল। চুপ করে চলে গেলেন মা। মা যে অভিমান করে চলে গেলেন একদমই বুঝল না জাবির। মায়ের চলে যাওয়াও টের পেল না। তখনো সে গেম নিয়ে ব্যস্ত ছিল। একটার পর একটা নতুন গেম খেলতেই থাকল। গেম খেলতে খেলতে মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে গেল। এখন কী আর করা, ইচ্ছে না থাকলেও মোবাইলটা ছাড়তে হলো।

মোবাইল চার্জে দিয়ে সে গেল রান্নাঘরে। রান্নাঘরে গিয়ে মা'র দেখা পেল। মায়ের কাছে খাবার চাইতেই মা জাবিরকে ভাত দিল। মা মুখে কোনো কথাই বললেন না। মা যে একটু চুপচাপ হয়ে গেছেন সে বিষয়টা খেয়ালই করল না জাবির।

জাবির মাঝে মাঝে দাদার সাথে নামাজ পড়তে যায়। আজকেও গেল। মাগরিবের নামাজ পড়ার জন্য দাদার সাথে মসজিদে গেল। মসজিদ থেকে ফেরার সময় দাদা বললেন, জাবির, তোমার মা'র কী হয়েছে?

কেন দাদা ভাই।

দেখলাম তোমার মা কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে। মুখটা মলিন লাগছে। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।

জাবির এবার স্কুল থেকে ফেরার পরের ঘটনাগুলো মনে করল। গেম খেলার সময় বিরক্ত এবং একটু রাগ করেই মায়ের সাথে কথা বলেছে। মা নিশ্চয়ই তার সাথে মন খারাপ করে আছেন। সবকিছু খুলে বলল জাবির। দাদা সব শুনে বললেন, নিশ্চয়ই মা তোমার ব্যবহারে অভিমান করেছে। তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সেই হাদিসটা জানো?

কোনটা দাদা? জানতে চায় জাবির।

একদিন একজন ব্যক্তি আসলেন আমাদের প্রিয় নবি হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমার কাছে সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী কে? রাসুল (সা.) বললেন, তোমার মা। লোকটি জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তারপরও তোমার মা। শেষ এবং চতুর্থবার লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, তারপর? মহানবি (সা.) এবার বললেন, তোমার বাবা।

জাবির বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, মা! তিনবার! মা তিনবার কেন, দাদা?

দাদা বললেন, কারণ তিনি দশ মাস দশ দিন কষ্ট করেছেন। তোমাকে জন্ম দিয়েছেন। বেশির ভাগ সময় না ঘুমিয়ে রাত জেগে বড়ো করেছেন। প্রতিদিন তোমার খাবারদাবারের চিন্তা করছেন। পড়াশোনার কথা ভেবেছেন। এখনো ভাবছেন। তোমার সবকিছুর চিন্তা তিনি করেন। তিনি তোমার জন্য নিজের সবকিছু ত্যাগ করেছেন। তাই উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকার তো মায়েরই হওয়ার কথা।

দাদার কাছে এসব শুনতে শুনতে জাবির বাসায় ঢুকল। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। এরপর ধীরে ধীরে রান্নাঘরে গেল। মা তখনো কী যেন রান্না করছেন। পিছন থেকে মাকে জড়িয়ে ধরল জাবির। এরপর বলল, মা, আমি খুবই দুঃখিত। আজ থেকে তোমার সব কথা শুনব। প্রথমবার বলার সাথে সাথে শুনব। তুমি মন খারাপ করো না মা। আমি এরকম ভাবে আর কখনো তোমার সাথে কথা বলব না।

একথা শুনে এক নিমিষেই মায়ের অভিমান ডানা মেলে উড়ে গেল দূরে অনেক দূরে। মা চোখ মুছতে মুছতে বললেন, আমি মন খারাপ করিনি তো সোনা। তুমি আমার লক্ষ্মী একটা ছেলে। তুমিই তো আমার সবচেয়ে বড়ো শক্তি। বলেই কপালে আদর করে দিলেন মা। তারপর বললেন, যাও পড়তে বসো। মন দিয়ে পড়বে। মানুষের মতো মানুষ হবে, এটাই আমি চাই।

জাবির লক্ষ্মী ছেলের মতো নিজের ঘরে এসে পড়তে বসল। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল মায়ের ডাকে প্রথমবারই সাড়া দেবে সে। একদম দেরি করবে না। ❑

শিশুসাহিত্যিক

মায়ের তুলনা নেই

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

মা শব্দটি খুব ছোটো কিন্তু গভীরতা অনেক। যার কোনো মাপকাঠি নেই। মায়ের তুলনা কেবল মা-ই। যিনি আমাদেরকে প্রায় দশ মাস অতি কষ্টে গর্ভে ধারণ করেন। জন্মের পর আমরা প্রথম তাকেই দেখি। যার কণ্ঠ শুনে আমরা শান্তি পাই। যার স্পর্শে আমাদের ভয় কেটে যায়। সেই পরম মমতাময়ী মানুষটিই হলেন মা।

মা রাত জেগে আমাদের আগলে রেখে বড়ো করেন। অসুস্থতায় পাশে থেকে যত্ন করেন। নিজের ভাগের সবচেয়ে ভালো খাবারটা না খেয়ে সন্তানের পাতে তুলে দেন। নিজের শখ বিসর্জন দিয়ে সন্তানের স্বপ্নকে বড়ো করে তোলেন। এই ত্যাগ কোনো খাতায় লেখা থাকে না। হিসাবও রাখা হয় না। মা চুপচাপ করে যান, কারণ তার ভালোবাসা শর্তহীন।

শিশু যখন হাঁটতে শেখে, তখন মা-ই পেছন থেকে দু'হাত বাড়িয়ে ধরে রাখেন। পড়ে গেলে তিনিই



আগে ছুটে আসেন। আবার উঠে দাঁড়ানোর সাহস যোগান। তেমনিভাবে জীবনের বড়ো বড়ো ধাক্কায়ও একই ভূমিকা। বিপদ-আপদে সবার আগে পাশে থাকেন।

মা শুধু জন্মদাত্রী নন, একজন শিক্ষিকাও। মায়ের কোলই শিশুর প্রথম পাঠশালা। তার কাছ থেকেই সন্তান তার ভাষা শেখে। মায়ের কাছ থেকেই প্রতিটি শিশু নতুন এই জগতের সবকিছুর পরিচয় জানে। ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক জীবনে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি ধীরে ধীরে শিখতে শুরু করে। গল্পের ছলে মা তার সন্তানকে নীতি শেখান।

অনেক বড়ো মানুষের সাফল্যের পেছনে মায়ের একটা কথা, একটা ধমক বা একটা উৎসাহ লুকিয়ে থাকে। 'তুই পারবি' এই দুটো শব্দ যখন মায়ের মুখ থেকে বের হয়, তখন অসম্ভবকেও সম্ভব মনে হয়।

সময় বদলায়, মা বদলান না। সন্তান ধীরে ধীরে বড়ো হয়। কাজ বাড়ে। দায়িত্ব বাড়ে। পড়াশোনা, চাকরি বা ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হয়। মায়ের ভূমিকা ও মমতা একই থাকে। মা তখনও বাড়ি থেকে মুঠোফোনে সন্তানের খোঁজখবর নেন।

আমরা বড়ো হয়ে মাকে সেভাবে মনে রাখতে পারি না। মাকে সময় দিতে প্রায়ই ভুলে যাই। ব্যস্ততার অজুহাতে মায়ের সঙ্গে অনেকের অনেক দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। এমনটা অনুচিত। পৃথিবীর সব সম্পর্ক বদলাতে পারে, কিন্তু মা-সন্তানের বন্ধন কখনো ফিকে হতে পারে না। আমাদের সবার উচিত মাকে যথাযথ সম্মান দেওয়া, তার সেবাযত্ন করা, তার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। বৃদ্ধ বয়সে মাকে একা না ফেলে রাখা। এটিই হবে মায়ের সীমাহীন মমতার প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা।

যদি জীবনে একজন মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে হয়, সে হলো মা। আর যদি একজন মানুষের জন্য কিছু করতে হয়, সেটাও মায়ের জন্য করা চাই, কারণ পৃথিবীতে তার ঋণ শোধ করার মতো কিছু নেই। ❑

শিক্ষার্থী, জামেয়া রহমানিয়া নূরিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, ময়মনসিংহ

মায়ের মমতা

জাহাঙ্গীর আলম

মায়ের মমতা ফুলের মতো
কোমল আর মিষ্টি
মায়ের স্নেহে ভরে ওঠে
জীবনের প্রতিটি দৃষ্টি।

মা যে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু
শ্রেষ্ঠ আপনজন
মায়ের ছোঁয়ায় জেগে ওঠে
সকল সুখের স্পন্দন।

দুঃখ এলে মা-ই আগে
চোখের জল মুছে
ভালোবাসার কথা বলে
আগলে রাখেন বুকে।

একাদশ শ্রেণি, খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন কলেজ, বনগ্রাম, মানিকগঞ্জ

আশার প্রদীপ

মো. নজরুল ইসলাম

মা হলো আশার প্রদীপ
অন্ধকারের আলো
মায়ের দোয়া ও ভালোবাসায়
জীবন হয় ভালো।

মাকে নিয়ে গর্ব করি
সকাল-দুপুর-রাতে
মায়ের ভালোবাসা রবে
সুখ-দুখের সাথে।

মা আমার হৃদয়ের মাঝে
থাকবে চিরকাল
মায়ের ভালোবাসা দিয়ে
শুরু হোক প্রতিটি সকাল।

দ্বাদশ শ্রেণি, নাসিরাবাদ কলেজ, ময়মনসিংহ

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দিন

সুমন প্রামাণিক



মা পৃথিবীর সবচেয়ে আপন মানুষ। জন্মের পর থেকে একজন সন্তানের জীবনের প্রতিটি ধাপে মায়ের ভালোবাসা, ত্যাগ, স্নেহ ও যত্ন জড়িয়ে থাকে। মায়ের ভালোবাসা নিঃস্বার্থ, নির্মল এবং চিরন্তন। একজন মা শুধু সন্তানকে জন্মই দেন না, তিনি তাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিরলস পরিশ্রম করেন। মায়ের অবদানকে সম্মান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য বিশ্বব্যাপী পালিত হয় 'বিশ্ব মা দিবস'। এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় মায়ের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ব মা দিবসের সূচনা হয় যুক্তরাষ্ট্রে। এই দিবসটি প্রতিষ্ঠার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন Anna Jarvis তিনি তাঁর মায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একটি বিশেষ দিনের প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে ১৯১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট Woodrow Wilson মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে মা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর ধীরে ধীরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই দিবসটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার বিশ্ব মা দিবস পালিত হয়। তবে কিছু দেশে ভিন্ন তারিখেও এই দিবস উদযাপন করা হয়।

একজন মা সন্তানের প্রথম শিক্ষক। শিশুরা মায়ের কাছ থেকেই প্রথম কথা বলা, হাঁটা, আচরণ শেখা এবং মানবিক মূল্যবোধ অর্জন করে। মায়ের শিক্ষা ও আদর্শ একজন মানুষের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মা সন্তানকে শুধু শারীরিকভাবে লালন-পালন করেন না, মানসিক ও নৈতিক দিক থেকেও শক্তিশালী করে তোলেন। সন্তানের সুখে তিনি হাসেন, আবার সন্তানের কষ্টে নিজেও কষ্ট পান। পৃথিবীর কোনো সম্পর্কই মায়ের ভালোবাসার সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

মা দিবস শুধু একটি আনুষ্ঠানিক দিবস নয়; এটি মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশের একটি বিশেষ সুযোগ। অনেক সময় ব্যস্ত জীবনে আমরা মায়ের অবদানকে স্বাভাবিক বলে ধরে নিই এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলে যাই। মা দিবস আমাদের সেই সুযোগ করে দেয়। এই দিনে সন্তানরা মাকে শুভেচ্ছা জানায়, উপহার দেয়, ফুল দেয় অথবা তাঁর সঙ্গে সময় কাটায়। অনেকেই মায়ের জন্য বিশেষ খাবারের আয়োজন করেন। তবে সবচেয়ে বড়ো উপহার হলো মায়ের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করা। একজন আদর্শ মা শুধু একটি পরিবার নয়, পুরো সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কারণ একজন মা তাঁর সন্তানকে সৎ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন। আজকের সমাজের সফল মানুষদের পেছনে তাঁদের মায়ের ত্যাগ ও অনুপ্রেরণা রয়েছে।

বর্তমান যুগে অনেক মা পরিবার ও কর্মজীবন একসঙ্গে সামলান। তাঁদেরকে ঘরের কাজ, সন্তানের যত্ন এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। এছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা চ্যালেঞ্জও তাঁদের মোকাবিলা করতে হয়। তবুও মায়েরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করে চলেন অক্লান্তভাবে। তাই শুধু মা দিবসে নয়, বছরের প্রতিটি দিন তাঁদের প্রতি সম্মান ও সহযোগিতা প্রদর্শন করা উচিত।

মা দিবস বিভিন্নভাবে পালন করা যায়। যেমন- মাকে শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানানো, তাঁর সঙ্গে সময় কাটানো, ফুল, কার্ড বা ছোটো উপহার দেওয়া, ঘরের কাজে তাঁকে সাহায্য করা, তাঁর পছন্দের খাবার তৈরি করা, তাঁর ত্যাগ ও অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এসব ছোটো ছোটো উদ্যোগ মায়ের মনে আনন্দ এনে দিতে পারে। মা আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তাঁর ভালোবাসা, ত্যাগ ও মমতার ঋণ কখনো শোধ করা সম্ভব নয়। বিশ্ব মা দিবস আমাদের সেই মহান মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি বিশেষ উপলক্ষ। তবে মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান শুধু একটি দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, যত্ন ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

মা হলেন ভালোবাসার অন্য নাম, ত্যাগের প্রতীক এবং সন্তানের জীবনের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। তাই আসুন, বিশ্ব মা দিবসে আমরা সকল মা'কে সম্মান জানাই এবং তাঁদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করি। ❑

সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্যা ভয়েস অব এশিয়া, ঢাকা



গল্প



মা-পাখি আর তিনটি ছানা

এস আই সানী

সকাল হয়েছে সেই ভোরে। তারপর টকটকে লাল সূর্য উঠেছে টগবগিয়ে। লতাপাতার ফাঁক গলিয়ে রোদ এসে পড়েছে খড়কুটোর বাসাটিতে। সূর্যের মিঠেরোদে ঘুম ভেঙেছে ছানা তিনটির। মা পাশে নেই দেখে চিঁ-চিঁ করে ডেকেছে বারকয়েক। তারপর আবারও চুপটি করে শুয়ে পড়েছে। ছোট্টবাসা, তাই ঠাসাঠাসি করে শুতে হয় ছানাদের।

খানিক পরে মা-পাখিটা বাসার কাছে এসে বসতেই বাচ্চা তিনটে উপর দিকে মুখ তুলে হা করে চিঁ-চিঁ স্বরে ডাকা শুরু করে দিলো।

কিন্তু তাদের চোখগুলো বন্ধ কেন? তাহলে কি এখনো ওদের চোখ ফোটেনি? তাই তো! ইশ! পৃথিবীতে এল অথচ পৃথিবীর আলো এখনো ওদের দেখা হলো না!

গায়ে দেখছি পশমও ওঠেনি! তুলতুলে গা। আহারে!

তাতে কী? ক'দিন পরে চোখও ফুটবে, পাখনাও উঠবে। তখন কত আনন্দ হবে ছানা তিনটির! নেচে নেচে উড়ে বেড়াবে। এডাল-ওডাল লাফিয়ে বেড়াবে। পোকা ধরবে। খেলা করবে। ঘুড়ি ওড়াবে!

ঘুড়ি ওড়াবে? পাখিদের ছানারা কি ঘুড়ি ওড়ায়? মানুষের শিশুরা বিকেল হলে রং-বেরঙের কত কত ঘুড়ি নিয়ে মাঠে যায়। তারপর জোরে বাতাস বইলে ঘুড়িগুলো আকাশে উড়িয়ে দেয়। কত সুন্দর লাগে সেই ঘুড়িগুলো দেখতে। কত উঁচু দিয়ে উড়তে উড়তে আকাশে পিঠ ঠেকিয়ে দেয়। তেমনি কি পাখিদের শিশুরাও ঘুড়ি ওড়ায়? তাদের ঘুড়ি কে বানিয়ে দেয়? সেগুলো দেখতে কেমন?

সারাদিন তো কত কত পাখি আকাশ বেয়ে উড়ে বেড়ায়। উড়তে উড়তে কত দূরে চলে যায়। আকাশের নীলে মিশে যায়। তাহলে তারা ঘুড়ি ওড়াবে কেন? তারা নিজেরাই তো একেকটা ঘুড়ি!

দুই.

বেচারি মা-পাখিটা ভীষণ অস্থির! বার বার উড়ে কোথাও যাচ্ছে, একটু পরে আবার ফিরে আসছে। আর তখনই ছানাগুলো কিছু খাওয়ার আশায় হা করে চিঁ-চিঁ স্বরে ডেকে উঠছে। কিন্তু মা-পাখিটা ওদের গালে কিছুই দিতে পারছে না। চারপাশে এত গাছগাছালি, কোথাও কি একটি পোকা নেই? আশেপাশে এত খালবিল, কোথাও কি একটি মাছ নেই? ক্ষুধার জ্বালায় কি ছানাগুলো মরে যাবে? না না!

মা-পাখিটা ভাবছে আর উড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ফিরতে হচ্ছে তাকে শূন্য ঠোঁটে। বাচ্চাগুলোর জন্য সে কোথাও কোনো খাবার খুঁজে পাচ্ছে না। আশপাশের সকল বিলেঝিলে সে ঘুরে এসেছে কয়েক বার। একটা মাছও পায়নি। বাগানের কোনো গাছেও একটা পোকামাকড় নেই।

আজ হলোটা কী? কোথাও কোনো মাছ নেই, পোকামাকড় নেই; না-খেয়ে কি মরতে হবে?

মা-পাখির নিজের পেটটাও ক্ষুধায় চোঁ-চোঁ করছে। উড়তে উড়তে সেও ক্লান্ত। ওড়ার শক্তি যেন হারিয়ে গেছে। ডানা দুটি যেন খসে পড়তে চাইছে। পাখনাগুলোও যেন শরীর ছাড়তে চাইছে। তবু না পারছে সে ছানাগুলো একা রেখে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে, না পারছে ছানাগুলোর কান্না সহ্য করতে। কী করবে মা-পাখি এখন! মাথা যেন ঘুরছে তার। যদি গায়ের গোশত কেটে খাওয়ানো যেত, তাহলে মা-পাখি তার ছানাগুলোর জন্য তাই করত।

ছানাগুলোর কান্না আর সহ্য করতে পারছে না মা-পাখিটা। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে–হে আল্লাহ! তোমার এত বড়ো দুনিয়ায় আমার বাচ্চাগুলোর জন্য এক টুকরো খাদ্যও কি নেই? ওদের কান্না যে আর সইতে পারছি না!

মা পাখি ভাবে–একটি জায়গায় গেলে অবশ্য খাবার মিলবে। একটি ধানক্ষেত। কিন্তু সেখানে জীবন যাওয়ার শঙ্কা! দস্যিছেলেরা ঢিল ছুড়তে থাকে। গুলতি দিয়ে গুলি ছুড়তে থাকে। তবুও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাকে সেখানে যেতেই হবে। কিন্তু যদি একটা ঢিল গায়ে এসে লাগে...! একটা গুলি গায়ে এসে লাগে...!

নাহ্! ভাবনা শেষ করতে পারে না মা-পাখি। আরো জোরে চিঁ-চিঁ করে ডেকে ওঠে ছানা তিনটে। আর স্থির থাকতে পারে না সে। হু-হু করে কেঁদে ওঠে



বুকের ভেতরটা। বাসা ছেড়ে উড়াল দেয় মা-পাখি। উড়তে উড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ওড়ার শক্তি ক্রমশ কমে আসে। তবুও শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে প্রাণপণে উড়তে থাকে। তারপর একসময় গিয়ে পৌঁছায় সেই ধানক্ষেতটার পাশে। ধানগাছগুলো এখনো ছোটো ছোটো। কচি। বাতাসে ডগাগুলো দোলখায়। ডানে-বাঁয়ে। অল্প-অল্প পানি ক্ষেতজুড়ে। আর এই অল্প পানিতে প্রচুর ছোটো মাছ কিলবিল করে সবসময়।

একটা গাছের ডালে বসে ঘুরেফিরে চারদিকে দেখে নেয় মা-পাখি। না, কোথাও নেই দস্যিছেলের দল। কপালটা বুঝি আজ ভালো–ভাবে মা-পাখি। বুকে সাহস এনে গাছের ডাল থেকে ক্ষেতের আইলে নেমে আসে। কিন্তু...!

অবাক হয় মা-পাখি। কোথাও কোনো মাছ নেই! হায় কপাল! একটু আগেও মনে হচ্ছিল ভাগ্যটা আজ কত ভালো। কিন্তু আসলেই যে পোড়াকপাল তার! এজন্যই বুঝি আজ দস্যিছেলেরা নেই! ভাবলো সে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ধানক্ষেতের ভেতর এদিকওদিক ছুটতে থাকে মা-পাখি। তবুও কোনো মাছের দেখা নেই। হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ ধানক্ষেতের ভেতর একটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পায় মা-পাখি। সেখানে বৃত্তাকারে লম্বা লম্বা কিছু কাঠি পোঁতা। খাঁচার মতো। তার ভেতরে একটা মাছ লাফালাফি করছে। আনন্দে চোখ দুটো চিকচিক করে ওঠে মা-পাখির। ভাবে–মাছটা ধরে নিয়ে আগে তার সোনামণিদের ঠান্ডা করবে। তারপর ওরা আরামে ঘুমোবে। তখন সে বেরুবে নিজের খাবারের খোঁজে।

ভাবনাগুলো শেষ হওয়ার আগেই এক লাফে কাঠিগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়ায় মা-পাখি। তারপর একটা কাঠির ফাঁক গলিয়ে গলাটা পুরে দেয় ভেতরে। দুঠোঁট দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে মাছটা। তারপর বের করে আনে। কিন্তু...!

থমকে যায় মা-পাখি। গলায় কিছুর একটা টান পড়ছে। দু'পা পিছিয়ে আসে সে। অনুভব করে আস্তে আস্তে গলাটা এঁটে যাচ্ছে। ফাঁসের মতো। কষ্ট হচ্ছে

দম নিতে। বুঝতে পারে–ফাঁদে পড়েছে সে।

ডানা ঝাপটে লাফালাফি শুরু করে মা-পাখি। মাছটা পড়ে যায় ঠোঁট থেকে। ঠিক সে মুহূর্তে দস্যিছেলেরা এসে ধরে ফেলে মা-পাখিকে। তীব্র যন্ত্রণায় বুকটা ফেটে যেতে চায় তার। ফাঁস-আঁটা স্বরে চেঁচিয়ে কিছু বলতে চায় মা-পাখি। বলতে চায়–মেরো না আমাকে, ছেড়ে দাও! তোমাদের মাকে যদি কেউ ধরে নিয়ে যায়, তখন তোমাদের কেমন লাগবে? তোমাদের মতো আমারও তিনটি বাচ্চা আছে! ওদের আমি ছাড়া আর কেউ নেই! ছেড়ে দাও আমাকে! মেরো না! একটু দয়া করো!

নাহ্! দস্যিছেলেরা কিছুই বুঝতে চায় না। পাখি ধরার আনন্দে আত্মহারা তারা। তাদের আনন্দ যে অন্যকারো জীবন যাওয়ার কান্না, তা কে বোঝাবে তাদের!

তিন.

ছেলেগুলো আজ খুবই আনন্দিত। পাখির মাংস দিয়ে বনভোজন করবে তারা। গ্রামের উত্তর পাশের শালবনে চলছে সব আয়োজন। এখন পাখিটাকে শক্ত করে ধরে সেদিকে নিয়ে চলল তারা।

আনন্দে লাফাতে লাফাতে চলছে দস্যিছেলেরা। এমন সময় স্কুলের শফিক স্যারের সাথে দেখা, শফিক স্যার সকলের প্রিয়। ছাত্রছাত্রীদের তিনি অনেক ভালোবাসেন। আদর করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে পড়ান। তাই তো সকল ছাত্রছাত্রী শফিক স্যারকে অনেক সম্মান করে, ভালোবাসে।

স্যারকে দেখে থমকে দাঁড়ায় দস্যিছেলেরা। আদবের সাথে সালাম দেয়। শফিক স্যার সালামের জবাব দেন। তাদের হাতে বন্দি পাখির দিকে নজর পড়ে তার। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'পাখি নিয়ে এভাবে কোথায় চলেছ তোমরা?'

ছেলেরা পাখির মাংস দিয়ে পিকনিকের কথা বলে। কোথায় কীভাবে আয়োজন চলছে, তাও বলে। তাদের কথায় স্যার ব্যথিত হন। তাদের থেকে পাখিটা নিজের কাছে নেন। তারপর সবার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, এই পাখিটা হয়ত একটা মা-পাখি। হয়ত বাসায় তার বাচ্চা আছে। তোমাদের মতো। যদি তোমাদের মাকে কেউ ধরে নিয়ে যায়, তাহলে তোমাদের কেমন লাগবে?'

ছেলেরা একে অন্যের দিকে তাকায়। কেউ কোনো কথা বলে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একসময় স্যারের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মাকে ছাড়া তো আমরা থাকতেই পারব না। আমাদের খুব কষ্ট হবে। কান্না করতে করতে মরে যাব।'

তাদের কথা শুনে স্যার সন্তুষ্ট হন। বলেন, 'এই মা-পাখিটাকে যদি তোমরা জবাই করে খাও, তাহলে তার বাচ্চাদের কে দেখবে? কে পালবে তাদের? তার বাচ্চারাও তো মা ছাড়া থাকতে পারবে না। কে তাদের খেতে দেবে? মায়ের জন্য কাঁদতে কাঁদতে তারাও তো মরে যাবে।'

স্যারের কথাগুলো শুনে ছেলেরা একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যায়। কেউ কিছু বলতে পারে না।

ছেলেদের নীরবতা দেখে স্যার আবার বলেন, 'তোমরা বরং পাখিটাকে ছেড়ে দাও। আর আমার সাথে চলো, তোমাদের মাংসের ব্যবস্থা আমিই করে দিচ্ছি।'

স্যারের কথা শুনে খুশি হয় ছেলেরা। আনন্দে তাদের চোখগুলো চিকচিক করে ওঠে। তারা স্যারকে পাখিটাকে উড়িয়ে দিতে বলে। শফিক স্যার পাখিটাকে আকাশে উড়িয়ে দেন। মুক্ত হয় মা-পাখি। দেহে প্রাণ ফিরে পায় সে। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ডানা ঝাপটে উড়ে চলে মা-পাখি নিজের বাসার দিকে, ছানাদের কাছে। ❑

শিশুসাহিত্যিক



মাকে মনে পড়ে

মুস্তাফা মাসুদ

‘মধুর আমার মায়ে হাসি
চাঁদের মুখে ঝরে,
মাকে মনে পড়ে
আমার মাকে মনে পড়ে।

হ্যাঁ, সব সময় মাকে মনে পড়ে। মা এমনই এক জ্যোতির্ময় সত্তা, যা আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে সারাজীবন জ্বলজ্বল করে। আমার মা-ও আমার কাছে তেমনি। প্রায় আশি ছুঁই ছুঁই (৭৮ বছর) বয়স আমার, তবুও মায়ের কথা মনে হলে আমি সেই ছোট্ট শিশুটি হয়ে যাই- মা আমাকে পরম আদরে ভাত মাখিয়ে মুখে তুলে খাওয়াচ্ছেন। কখনও চিতই পিঠে কিংবা ভাপা পিঠে খাওয়ার জন্য বায়না ধরেছি শীতের সন্ধ্যেবেলা। মা ঠিকই সব কাজ ফেলে রেখে পিঠে বানাতেন- কখনও চিতই পিঠে, কখনও ভাপা পিঠে। এই তো মা। করুণাময়ী মা।

১৯৮৯ সালের ৭ই এপ্রিল আমি আমার মাকে হারাই চিরদিনের জন্য। এর কয়েক মাস আগে মা আমার ঢাকার বাসায় গিয়েছিলেন। আমার কর্মস্থল শিশু একাডেমিতে গিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন আমি কোথায় বসি, কাজ করি। মায়ের সে কী আগ্রহ আমার অফিসে গিয়ে! অনেকক্ষণ বসে থেকে তারপর এসেছিলেন। এর কয়েকদিন পর বাড়ি যাওয়ার জন্য জিদ ধরেন। বলেন, বাড়ির জন্য পরান পোড়ে, শহরে আর ভালো লাগছে না। সেই যে মা বাড়ি গেলেন, কয়েক মাসের মধ্যেই মারা গেলেন।

আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে মা চলে গেছেন অনন্তলোকে। আমিও বুড়ো হয়ে গেছি। কিন্তু মায়ের অম্লান স্মৃতিগুলো আজও জীবন্ত হয়ে আছে মনের পটে।

আমার মা ছিলেন স্বশিক্ষিত। জীবনে কোনোদিন স্কুলে বা পাঠশালায় যাননি। কিন্তু কীভাবে যেন তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন। কীভাবে কার কাছে শিখেছিলেন তা জানি না। তার সুমধুর কণ্ঠে 'বিষাদসিন্ধু' পাঠ শুনতে পাড়ার মেয়েরা আমাদের বাড়িতে আসত। আমিও তাদের সাথে বসে যেতাম। মা 'বিষাদসিন্ধু' থেকে প্রায় সুর করে, বিশেষ ভঙ্গিতে আবৃত্তি করতেন। বিষাদসিন্ধুতে রহস্যের নামমাত্র নাই। ছত্রে ছত্রে বিষাদ। বিষাদে আরম্ভ বিষাদেই সমাপ্ত। তারপর তিনি যখন হোসেন-পুত্র কাসেমের নব-পরিণীতা বধূ সখিনার অকাল বৈধব্যের বিষয়টি উল্লেখ করতেন, তখন উপস্থিত কেউ আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারত না। ছয়-সাত বছরের এই আমিও অজান্তে চোখের পানি ফেলতাম।

আমার মায়ের শুধু বিষাদ-সিন্ধু নয়, আরো কিছু বই ও পুঁথি তার সংগ্রহে ছিল। মোহাম্মদ নজিবর রহমানের লেখা 'আনোয়ারা' উপন্যাসটি সেই বয়সেই দেখেছি মায়ের কাছে। মা সেটিও মাঝে মাঝে পাঠ করে শোনাতেন। শুনতে শুনতে আনোয়ারা উপন্যাসের বহু জায়গা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আরেক মজার উৎসব ছিল পুঁথিপাঠ। সাধারণত বর্ষার বিকেলে বা সন্ধ্যায় কুপিবাতি জ্বালিয়ে মা পুঁথিপাঠের আসর বসাতেন। তার সংগ্রহে ছিল সোনাভান, গাজী কালু, চম্পাবতীর পুঁথি। সয়ফল মূলুক বদিউজ্জামাল, ইউসুফ জুলেখা প্রভৃতি পুঁথি। ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা হয়ত পুঁথি দেখোনি বা তার পাঠ শোনোনি। কিন্তু একসময় গ্রামীণ জীবনে এই পুঁথিপাঠ ছিল বিনোদনের মাধ্যম। আমার মা তাঁর অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠে পুঁথি পাঠ করে সবাইকে মুগ্ধ করতেন। আমার এখনও মনে পড়ে- মা ইউসুফ জুলেখা পুঁথি সুর করে আবৃত্তি করতেন-

(আরে) ছয়ভাগ রূপ আল্লা আলমে ভেজিল,
তার মাঝে চারিভাগ ইউসুফেরে দিল ॥

আমার মায়ের আরেকটি গুণ ছিল- মা ছিলেন একজন নামকরা কবিরাজ। বন্ধুরা, সে সময় গ্রামেগঞ্জে ডাক্তারের খুব অভাব ছিল। সেই দূরে থানা সদরে একটা সরকারি ডিসপেনসারি ছিল। সেখানে ওষুধ বলতে এক ধরনের মিক্সার পাওয়া যেত। সেখানে যাওয়াও ছিল ঝক্কির। মা নানা ধরনের গাছগাছড়া বেটে ওষুধ তৈরি করতেন এবং তাতে অসুখও সারত। বিশেষ করে মায়ের তৈরি জোলাপ কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ছিল অব্যর্থ। বহুদূর থেকে রোগীরা আসত এই জোলাপ নিতে। এই কবিরাজি বিদ্যেটিও মা কোথা থেকে কীভাবে শিখেছিলেন তা জানা হয়নি। জিজ্ঞেস করলে মা শুধু মিষ্টি করে হাসতেন। খুলে বলতেন না কিছু।

আমরা ছিলাম ছয় ভাই, দুই বোন। বড়ো দুই ভাই আর এক বোন আমার জন্মের আগেই মারা যায়।

চার ভাই আর এক বোন- এই পাঁচ ভাইবোনের সংসার পরম নিপুণতায় সামলাতে দেখেছি মাকে। আমার ছোটোবেলায় দেখেছি- আব্বা বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন সংসারের সব দায়িত্ব এসে পড়ে মায়ের ওপর। মাঠে জমিজমা ছিল। সেগুলো কামলা -মজুর লাগিয়ে চাষ করা, ফসল তোলা- সবকিছুরই ব্যবস্থাপনা মাকে করতে হতো। এতে সংসার মোটামুটি চললেও খুব স্বচ্ছল ছিল না। তারপরও মা কেমন করে যেন সবকিছু গুছিয়ে সংসার চালিয়ে নিতেন। আমরা খুব একটা অসুবিধায় কখনও পড়িনি। মনে পড়ে একবার খুব আকাল হয়েছিল। খাবারের অভাব প্রকট। এক দুপুরে রান্নার কিছু নেই। মা বিচলতি হননি। চাল-ডাল আর সেই সাথে লাউ শাকের মিশেল দিয়ে এমন চমৎকার জাউ রান্না করলেন, যার স্বাদ আজও মুখে লেগে আছে। আমার সংসারে বহুবার চেষ্টা করেছি সেরকম জাউ খাওয়ার কিন্তু তেমনটা আর হয়নি।

দুই ঈদে মায়ের সচেতনতা ছিল দেখার মতো। রোজার ঈদে আমাদের জন্য নতুন লুঙ্গি আর শার্ট থাকবেই। তবে কুরবানির ঈদে কোনো নতুন কাপড় কেনা হতো না। একভাগ কোরবানি ঠিকই দিতেন- যেখানে গাঁয়ের অনেকেই কোরবানি দিতো না বা দিতে পারত না। মা সারা বছর টাকা গুছিয়ে রাখতেন অল্প অল্প করে। সেই টাকায় কোরবানি হতো কিংবা রোজার ঈদের কাপড় কেনা হতো।

এমনি কত কথা, কত স্মৃতি মাকে ঘিরে! চোখ ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। তবে মায়ের মৃত্যুদিন ৭ই এপ্রিল এলে সব যেন নতুন করে চোখের ওপর ভেসে ওঠে। মা! মাগো! সময় হয়ে এল তোমার সাথে মিলিত হওয়ার। ❑

শিশুসাহিত্যিক

মায়ের স্বপ্ন

হাফিজ মুহাম্মদ

মায়ের কোলে ছোট্ট খোকন
মায়ের স্বপ্ন কী যে,
আদর সোহাগ আগলে রাখে
রিক্ত হলেও নিজে।

খোকন সোনা চাঁদের কণা
জগৎ জুড়ে নেই তুলনা
শুধায় মধুর বাণী,
স্নেহ ছায়া উছলে পড়ে
মায়ের ভুবনখানি।

দুখের পরশ খোকন পেলে
মায়ের দু'চোখ ঝরে,
হাসিখুশি থাকলে খোকন
মায়ের পরান ভরে।

মায়ের হাসি

ফরিদ সাইদ

মা করেছেন গর্ভে ধারণ
কঠিন ব্যথার মাঝে
জন্ম থেকে সব সয়েছেন
সকাল-দুপুর সাঁঝে।

দুঃখ-জ্বালা ভুলে যেতেন
বুকের মানিক বলে
আদর স্নেহ ভালোবাসায়
টেনে নিতেন কোলে।

মা জননী জান্নাতি সুখ
মা আছেন যার ঘরে
থাকতে সময় সবাই যেন
মায়ের সেবা করে।

মায়ের মুখের হাসি ফোটাও
ফল পাবে বেশ ভালো
জেনে রেখো মা জননী
দোজাহানের আলো।

প্রাণের প্রদীপ

আলিম রহমান শুভ

প্রথম পর্ব - মেঘলা

আষাঢ় মাস। সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি বনে এমন বৃষ্টি নতুন কিছু নয়। কিন্তু সেই রাতটি ছিল বিশেষ। কারণ সেদিন জন্ম নিয়েছিল এক আশ্চর্য বাচ্চা হাতি। তার গায়ের রং ছিল গোলাপি। ভোর হতেই খবর ছড়িয়ে পড়ল পুরো বনে। দূরদূরান্তের পাহাড়ি বন থেকে হাতির দল ছুটে এল তাকে দেখতে। কাপ্তাই লেকের দুই তীরের কেউ কখনো এমন বাচ্চা দেখেনি। মনে হচ্ছিল, ভোরের আকাশের গোলাপি আভা যেন কেউ তুলে এনে তার শরীরে মেখে দিয়েছে। বনের বুড়ো হাতিরা বলাবলি করছিল, বৃষ্টির রাতে জন্ম নেওয়া বাচ্চাদের মন খুব কোমল হয়। পানির মতো। যে রূপ দাও, সে রূপই ধারণ করে। বাচ্চাটির নাম রাখা হলো পিঙ্কু। কিন্তু পিঙ্কুর এসব নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না। সে সারাদিন মায়ের শরীর ঘেঁষে থাকত। সে মায়ের পেটের কাছে মুখ লুকিয়ে থাকত আবার মায়ের ছায়াতেই ঘুমিয়ে পড়ত।

পৃথিবীতে তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার মা। তার নাম মেঘলা। মেঘলা ছিল দলের সবচেয়ে শান্ত স্বভাবের হাতি। অন্য হাতিরা যখন নদীর ধারে হইচই করত, তখন সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে নীরবে সব দেখত। পিঙ্কু হয়েছে ঠিক তার উলটো। সে ছিল চঞ্চল, দুষ্টু আর কৌতূহলী। নতুন কিছু দেখলেই দৌড়ে যেত। কখনো প্রজাপতির পেছনে, কখনো কাঠবিড়ালির পেছনে, আবার কখনো পাহাড়ের ঢালে ফুটে থাকা বুনো ফুলের দিকে। আর মেঘলা? সে সব সময় তার





পেছনেই থাকত। পিঙ্কু খেলতে গেলে মেঘলা পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। পিঙ্কু পাথরের ওপর উঠলে নিচে অপেক্ষা করত। পিঙ্কু ঘুমিয়ে পড়লে সারারাত পাহারা দিত। দলের বয়স্ক হাতিরা মাঝে মাঝে হাসত। মেঘলা, একটু ছাড়ো ওকে। বাচ্চাটাকে বড়ো হতে দাও। মেঘলা হেসে বলত, আমি যদি আমার বাচ্চার যত্ন না নিই, তাহলে কে নেবে? তারপর পিঙ্কুর দিকে তাকিয়ে শুঁড় দিয়ে আলতো করে ছুঁয়ে দিত। মায়ের ভালোবাসা কখনো কমে না। সন্তান যত বড়োই হোক না কেন।

সময় গড়াতে লাগল। আষাঢ় পেরিয়ে শ্রাবণ, শ্রাবণ পেরিয়ে ভাদ্র। তারপর এল কার্তিক। সেদিনও আগের রাত থেকে বৃষ্টি হয়েছিল। পাহাড়ের ঢাল ভিজে পিচ্ছিল হয়ে আছে। কাপ্তাই লেকের পানি বেড়ে গেছে অনেকটা। সকালে হাতির দল খাবারের খোঁজে পাহাড়ি পথে এগোচ্ছিল। সামনে দলের অভিজ্ঞ হাতিরা, মাঝখানে বাচ্চারা, আর পেছনে মেঘলাসহ কয়েকজন মা হাতি। এক সময় তারা রাঙামাটি জেলার লিটন টিলার ঢালে থামল। চারপাশে সবুজ ঘাস। দূরে রোদের আলোয় ঝিকমিক করছে কাপ্তাই লেক। বড়োরা বিশ্রাম নিচ্ছিল। আর বাচ্চারা খেলছিল নিজেদের মতো। পিঙ্কুও খেলছিল। খেলতে খেলতে সে চলে গেল পাহাড়ের কিনারার কাছে। সেখানে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকাতেই সে অবাক হয়ে গেল। লেকের কালো পানিতে যেন আরেকটি গোলাপি হাতি! আসলে সেটা ছিল তার নিজেরই প্রতিবিম্ব। পিঙ্কু মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। ঠিক তখনই পেছন থেকে মেঘলা ডাকল।

— পিঙ্কু!

পিঙ্কু চমকে উঠল।

সে ভাবল, হয়ত নিচ থেকে কেউ তাকে ডাকছে। আরও ভালো করে দেখার জন্য একটু সামনে এগোতেই ভেজা পাথরে তার পা পিছলে গেল। একমুহূর্ত। শুধু একমুহূর্ত।

তারপর-

ছপাৎ করে একটা শব্দ।

আর তারপর চারদিকে নেমে এল ভয়ংকর নীরবতা। মেঘলা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি। কিন্তু যখন সে দৌড়ে পাহাড়ের কিনারায় পৌঁছালো, তখন তার বুক কেঁপে উঠল। অনেক নিচে, লেকের জলে পিঙ্কুর গোলাপি শরীর ভাসছে। নিশ্চল। এত নীরব পিঙ্কুকে আগে কখনো দেখেনি সে।

মেঘলা ডাকল।

— পিঙ্কু!

কোনো সাড়া নেই। সে আবার ডাকল। আরও জোরে। তার সেই ডাক পাহাড় পেরিয়ে, বন পেরিয়ে, অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। দলের সব হাতি ছুটে এল। কিন্তু কেউ কিছু করতে পারল না। নিচে খাড়া ঢাল। তারও নিচে গভীর পানি। সারারাত মেঘলা পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। সে শুঁড় উঁচু করে বারবার ডাকছিল। হয়ত ভাবছিল, পিঙ্কু আবার তার কাছে ফিরে আসবে। আবার তার কাছে দৌড়ে আসবে। আবার শুঁড়ে মুখ ঘষবে। কিন্তু তা আর হলো না। পরদিন বনবিভাগের লোকজন এল। তারা পিঙ্কুকে পানি থেকে তুলতে চাইল। কিন্তু মেঘলা কাউকে কাছে যেতে দিল না। কেউ এগিয়ে এলেই সে তেড়ে



যাচ্ছিল। তার চোখে তখন ভয় ছিল না। ছিল শুধু এক মায়ের আকুতি। দিন পেরিয়ে গেল।

একদিন। দুইদিন। তিনদিন। চারদিন। পাঁচদিন।

মেঘলা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সে ঠিকমতো খায়নি। পানিও খায়নি। বিশ্রাম নেয়নি। শুধু তার সন্তানের দিকে তাকিয়ে ছিল। যেন এক মুহূর্তের জন্যও চোখ সরালে পিঙ্কু হারিয়ে যাবে। ষষ্ঠ দিনের বিকেলে বন কর্মকর্তারা আবার এলেন। সেদিন মেঘলা সামান্য সরে দাঁড়ালো। মাত্র কয়েক কদম। হয়ত সে বুঝেছিল, এবার বিদায় বলার সময় এসেছে। ধীরে ধীরে পিঙ্কুর শরীর পানি থেকে তোলা হলো। মেঘলা দূর থেকে দেখল শেষবারের মতো। তারপর লিটন টিলার মাটিতে পিঙ্কুকে সমাহিত করা হলো।

সেই পাহাড়েই যেখান থেকে সে পড়ে গিয়েছিল। সব কাজ শেষ হলে মেঘলা কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। একা। এত বড়ো জঙ্গলে সে খুব একা। পাহাড়ের পথ ধরে সে হারিয়ে গেল বনের গভীরে। হয়ত সে নিজের মনেই বারবার একটি প্রশ্ন করছিল 'আমি যদি আরেকটু আগে ডাকতাম?' কিন্তু পৃথিবীর কোনো মায়েরই সব প্রশ্নের উত্তর জানা থাকে না। তারা শুধু ভালোবাসতে জানে। আর সেই ভালোবাসাই পৃথিবীর সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রদীপ।

দ্বিতীয় পর্ব -আঁধারি

সুন্দরবনে সকাল আসে একটু দেরিতে। ঘন ম্যানগ্রোভ বনের মাথার ওপর ছড়িয়ে থাকা সবুজ

ছাউনি ভেদ করে সূর্যের আলো মাটিতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেকটা সময় লেগে যায়। তাই ভোরবেলায় বনটা যেন আধো অন্ধকারে ঢাকা থাকে। সেই অন্ধকারের মধ্যেই এক খাঁড়ির ধারে বাস করত এক বাঘিনি। তার নাম আঁধারি। আঁধারির ছিল দুটি ছোট্ট বাচ্চা। তাদের চোখ সবে খুলেছে। তারা এখনো ঠিকমতো হাঁটতে শেখেনি। পৃথিবী তাদের কাছে নতুন। বাতাসের গন্ধ, পাতার শব্দ, জোয়ারের জল সবকিছুই তাদের কাছে বিস্ময়। আর সেই বিস্ময়ের পৃথিবীকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব ছিল আঁধারির। প্রতিদিন ভোরে সে বাচ্চাদের গা চেটে পরিষ্কার করত। কখনো তাদের সঙ্গে খেলত, কখনো শিকার শেখানোর ভান করত। কিন্তু খেলার মাঝেও তার কান সব সময় খাড়া থাকত। কারণ সে জানত বনে বিপদ কখনো বলে আসে না।

এক শীতের সকালে কয়েকজন মধু সংগ্রহকারী সেই বনের ভেতরে ঢুকল। তারা জানত না কাছেই আঁধারির আস্তানা। জানত না, ঝোপের আড়ালে দুটো ছোট্ট বাঘ ছানা ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু আঁধারি জানত। সে প্রথমে দূর থেকে গর্জে উঠল। সতর্ক করল। যেন বলতে চাইল 'আর কাছে এসো না।' লোকগুলো ভয় পেয়ে ফিরে গেল। পরদিন অন্য পথে আবার এল। তবে এবার এরা খালি হাতে আসেনি। বাঘের ভয় থেকে রেহাই পেতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে এল। আঁধারির কাছে তখন একটাই ভাষা বাকি ছিল। যে ভাবেই হোক তার বাচ্চাদের বাঁচাতেই হবে। সেই বার্তাটা ছিল সহজ, আমার বাচ্চারা এখানে আছে। তোমরা যাও এখান থেকে। আমার বাচ্চার কাছে যেও না। আঁধারি মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারত না। তার কাছে যা ছিল তা-ই দিয়েছিল। নিজের শরীর। নিজের জীবন।

সেই শীতে এক মাসে আঁধারির এলাকায় আটজন মানুষ আহত হলো। গোটা সাতক্ষীরায় আতঙ্ক ছড়ালো। বনবিভাগ সতর্ক হল। খবর গেল ঢাকায়। কিন্তু আঁধারির বাচ্চারা বেঁচে রইল। সেটাই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধগুলো কোনো রাজ্যের জন্য হয়নি। হয়েছে একটা বাচ্চার জন্য যে হয়ত তখনো কথাও বলতে শেখেনি।

তৃতীয় পর্ব- শিশির

সুন্দরবনে ভোর হয় কেওড়া পাতার তেতো সুবাস, জোয়ারের নোনা জলের ঘ্রাণ, আর ভেজা মাটির একটা পুরনো পরিচিত সুবাস দিয়ে। এই তিনটে মিলে যখন নাকে আসে, তখন বোঝা যায় সকাল হয়েছে। আলো তখনো আসেনি। ম্যানগ্রোভের ঘন চাঁদোয়ার নিচে অন্ধকারটা একটু ধূসর হয়েছে মাত্র। এই আধো-আলোয় শিশির তার বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছিল।

শিশির একটি চিত্রা হরিণ। সুন্দরবনের কটকা এলাকায়, যেখানে কেওড়া গাছের সারি লেকের মতো একটা খাঁড়ির ধারে নেমে গেছে সেখানে সে থাকে। তার গায়ে সাদা ফুটকি, পিঠে রোদের আলোর মতো ছোপ। বাচ্চাটার বয়স মাত্র তিন সপ্তাহ। সে এখনো দৌড়াতে পারে না। এখনো ঘাস চেনে না। শুধু জানে একটা কথা মায়ের নিচে গেলে উষ্ণ লাগে, আর মায়ের কাছে গেলে খিদে মেটে। শিশির বাচ্চাটাকে খাওয়াতে খাওয়াতে কান খাড়া রাখে। সুন্দরবনে সকালবেলা সবচেয়ে বিপজ্জনক। বাঘ তখন শিকার থেকে ফিরে, কুমির তখন ডাঙায় ওঠে।

একজন মায়ের ঘুম কখনো গভীর হয় না। সুন্দরবনে চিত্রা হরিণের মা প্রায় সাত মাস বাচ্চা পেটে রাখে। সাত মাস মানে একটা বর্ষা পার করা, একটা শীত পার করা, আর প্রতিদিন খাবারের জন্য হাঁটতে হাঁটতে নিজের পেটের ভার বহন করা। শিশির সেই সাত মাস কী করেছিল? সে খেয়েছিল কিন্তু এখন আর শুধু নিজের জন্য খায় না। এখন আর শুধু নিজেকে বাঁচাতে না, দুজনকে বাঁচাতে হলে তাকে খেতে হবে। এইভাবে একটা সত্তা থেকে দুটো হয়ে যায়। একটা জীবন দুটো জীবন বহন করতে শেখে।

বাচ্চাটা জন্মেছিল ভোরে। বর্ষার শুরুতে। শিশির তখন একটা ঝোপের আড়ালে ছিল একা। হরিণের মায়েরা একা বাচ্চা দেয়। দলের থেকে সরে গিয়ে, নিজের মতো করে। কারণ এই মুহূর্তটা শুধু

দুজনের। বাচ্চাটা যখন বেরিয়ে এল, শিশির সঙ্গে সঙ্গে তাকে চাটতে শুরু করল। শুধু পরিষ্কার করতে না শ্বাস নিতে শেখাতে, উষ্ণ রাখতে। বুঝাতো যে এই পৃথিবীতে তুমি একা নও। মাও আছে তোমার সাথে। বাচ্চাটা প্রথম টলমল পায়ে উঠে দাঁড়ালো। পড়ে গেল। উঠল। আবার পড়ল।

শিশির পাশে দাঁড়িয়ে দেখল। সরে গেল না। ধরতেও গেল না। শুধু পাশে থাকল কারণ একজন মা জানে, কখন সাহায্য করতে হয় আর কখন শুধু পাশে থাকতে হয়। দিন গড়ালো। বাচ্চাটা বড়ো হতে লাগল। সুন্দরবনে হরিণের বাচ্চা ছয় মাস মায়ের দুধ খায়। ছয় মাস মানে প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে নিয়ম করে। এই ছয় মাস শিশির নিজে যা খায়, তার অনেকটাই যায় বাচ্চার দুধে। শিশির জানে না এই হিসেব। সে শুধু জানে বাচ্চা কাছে এলে দুধ দিতে হয়।

একবার খরায় খাঁড়ির পানি কমে গেল। ঘাস শুকিয়ে গেল। শিশিরকে দূরে যেতে হলো খাবারের খোঁজে। বাচ্চাটাকে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রেখে গেল। চুপ থাকো, নড়ো না, আমি আসছি। হরিণের বাচ্চারা লুকিয়ে থাকতে পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। নিশ্চল, নিশ্বাস ছোটো করে। এটা তারা মায়ের কাছ থেকে শেখে কীভাবে বিপদে শান্ত থাকতে হয়। শিশির খাবার খুঁজে এসে আগে বাচ্চাটাকে ডাকল একটা নরম শব্দে। বাচ্চাটা ঝোপ ভেঙে বেরিয়ে ছুটে এল। সেই দৌড়ে আসাটুকু দেখলে বোঝা যায় সন্তান মাকে কতটা চেনে। কোনো গন্ধ লাগে না, কোনো দেখা লাগে না শুধু একটা পরিচিত শব্দ, আর পুরো পৃথিবী নিরাপদ হয়ে যায়।

সেই বছর জুলাইয়ে বাঘ এল। শরণখোলা রেঞ্জের কাছে, কেওড়া বনের ভেতর। বাচ্চাটা তখন ঘুমিয়ে। শিশির পাশেই খাবারের খোঁজ করছিল। হঠাৎ বাতাস বদলালো। শিশিরের নাকে এল সেই গন্ধ। পুরনো গন্ধ। রক্তের মতো ভারী। শিশির ঘুরল। বাচ্চার দিকে তাকাল। তারপর সে যা করল তা কোনো বইয়ে লেখা নেই। কোনো প্রশিক্ষণে শেখানো



হয়নি। সে বাচ্চার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বাঘের দিকে মুখ করে। নিজের শরীরকে ঢাল বানিয়ে।

শিশির ভয়ে কাঁপছিল। তার পা থেকে কান পর্যন্ত কাঁপছিল। ভয় পেলে হরিণের পুরো শরীর কাঁপে, লোম খাঁড়া হয়, নাড়ির গতি বাড়ে। কিন্তু শিশির পালালো না। ভয় পাওয়া আর সাহসী হওয়া দুটো আলাদা জিনিস নয়। ভয় পেয়েও না পালানো এটাই সাহস। আর এই সাহসটুকু মায়েদের কাছ থেকেই পৃথিবী প্রথম শিখেছিল।

বাঘ শিশিরের এমন সাহসিকতা আগেও দেখেছে। সে জানে একজন মা তার সন্তানের জন্যে কী করতে পারে। প্রয়োজনে জীবনও দিতে পারে। ক্ষুধার কথা ভুলে গিয়ে সে মায়ের স্মৃতি মনে করতে করতে পিছিয়ে গেল। কিছুক্ষণ শিশির আর তার বাচ্চার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর অন্য দিকে চলে গেল। যাওয়ার সময় সে এক ভয়ংকর গর্জন দিলো। হয়ত মায়ের সাথে কথা বলার চেষ্টা করল।

শিশিরের বাচ্চাটা ঘুম থেকে উঠল। মায়ের কাছে এল। দুধ খেলো। শিশির কিছুই বুঝতে পারল না যে কী হয়েছিল। জানার দরকারও নেই। সে শুধু জানে সে একজন মা।

মাস গড়ালো। বাচ্চাটা ঘাস খেতে শিখল। দৌড়াতে শিখল। সাঁতার কাটতে শিখল। এক সন্ধ্যায় সে প্রথমবার একা একটু দূরে গেল। শিশির পেছনে গেল না। দাঁড়িয়ে দেখল। কিন্তু চোখ সরালো না।

বাচ্চাটা ঘুরল। মাকে দেখল। তারপর আবার এগোলো। এইভাবেই হয়। প্রতিটা বাচ্চা একদিন একা হাঁটতে শেখে। প্রতিটা মা একদিন পেছনে দাঁড়িয়ে দেখে। কিন্তু সেই দেখার মধ্যে যে টান থাকে সেটা কখনো কমে না।

সুন্দরবনে এখন প্রায় ৮০,০০০ চিত্রা হরিণ। প্রতিটা হরিণের পেছনে এই গল্প আছে। প্রতিটার জন্য একজন মা ছিল। যে সাত মাস ভার বহন করেছে, ছয় মাস দুধ দিয়েছে, আর একমুহূর্তের জন্যও বাচ্চাকে একা রাখেনি। তাদের নাম কেউ জানে না। তারা বনের ভেতর বাঘের সাথে যুদ্ধ করে টিকে আছে। বাঘ আছে কারণ হরিণ আছে। হরিণ আছে কারণ মায়েরা আছে। পৃথিবীর প্রতিটা বন, প্রতিটা জঙ্গল, প্রতিটা সভ্যতার গোড়ায় একজন মা আছে।

মেঘলা ছয় দিন লেকের পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপরও চলে যেতে পারেনি। আজও কখনো কখনো সে ফিরে আসে সেই টিলার ধারে। যেখানে শেষবারের মতো পিঙ্কুকে দেখেছিল। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। যেন এখনো অপেক্ষা করছে হঠাৎ করে গোলাপি একটা ছায়া দৌড়ে এসে তার শুঁড়ে মুখ ঘষবে।

আঁধারি বনের পর বন ছুটে বেড়িয়েছিল। কারণ তার বাচ্চাদের বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে জরুরি আর কিছু ছিল না। শিশির বাঘের সামনে দাঁড়িয়েছিল। কারণ সেই মুহূর্তে নিজের জীবনের কথা তার মনেই আসেনি। তিনটি আলাদা জঙ্গল। তিনটি আলাদা প্রাণী। তিনটি আলাদা গল্প। কিন্তু তাদের বুকের ভেতর জ্বলছিল একই আলো। সেই আলো ভালোবাসার। সেই ভালোবাসার কোনো ভাষা নেই। কোনো প্রজাতি নেই। পৃথিবীর সব মা একই ভাষায় ভালোবাসেন। সন্তান বিপদে পড়লে হাতি কাঁদে। বাঘিনি লড়াই করে। হরিণী নিজের শরীরকে ঢাল বানিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আর মানুষ? মানুষও ঠিক তাই করে। কারণ 'মা' শুধু একটি শব্দ নয়। এটি একটি আশ্রয়, প্রার্থনা। একটি নিরাপদ পৃথিবীর নাম।

মা দিবসে পৃথিবীর প্রতিটি মায়ের প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা। মানুষ হোক, হাতি হোক, হরিণ হোক কিংবা বাঘিনি। যারা নিজেদের কথা ভুলে গিয়ে সন্তানের জন্য বেঁচে থাকে। যারা শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে। যারা শেষ পর্যন্ত লড়াই করে। যারা শেষ পর্যন্ত ভালোবাসে। কারণ, পৃথিবীর সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রদীপটি মা। ❑

লেখক ও চলচ্চিত্র পরিচালক



প্রাণিজগতের মা

ইভা ফারহানা

মা- এই ছোট্ট শব্দটির মাঝেই লুকিয়ে আছে পৃথিবীর সকল শান্তি। মায়ের তুলনা শুধু মা-ই। এই ছোট্ট শব্দটির মাঝেই লুকিয়ে আছে গভীর ভালোবাসা, নিরাপত্তা আর ত্যাগের গল্প। মানুষ ছাড়াও প্রতিটি প্রাণীর ক্ষেত্রেও মা-ই হলো সবচেয়ে আপন। পশুপাখি বলে তাদের বুদ্ধি মানুষের মতো অতো প্রখর নয়, তাই বলে মাতৃত্ববোধে তারাও কিন্তু কম পিছিয়ে নেই। চলো তাহলে সেইসব মাতৃত্ব সম্পর্কে জেনে নেই।

ডলফিন: বাচ্চা ডলফিনগুলো খুবই চঞ্চল হয়। সবসময় এদিক-সেদিক ঘুরঘুর করে। তাই তাদের মাকে হতে হয় তৎপর নয়তো বাচ্চা যাবে হারিয়ে কিংবা হিংস্র হাঙ্গর এসে তাদের ধরে নিয়ে যাবে। বাচ্চারা যদি দুষ্টুমি করে, শান্ত না হয়, তাহলে তাকে কিছুক্ষণ পানির নিচে চেপে ধরে রাখে। একটু শাসন আর কি! প্রায়ই সব মায়েরা একত্রে গোল হয়ে ঘোরে, যাতে তাদের মাঝখানে তাদের সন্তানেরা নিরাপদে খেলতে পারে।

ক্যাঙ্গারু: ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাদের কী আরাম, কারণ সে তো জন্মের পর কয়েক মাস থাকে তার মায়ের পেটের থলিতে। জন্মের পর পর বাচ্চাগুলো এতটাই রুগ্ন থাকে যে, বাইরের আবহাওয়ার জন্য সে মোটেই উপযোগী থাকে না। তার চোখ ফোটে না, গায়ে লোম থাকে না। বেচারা নড়াচড়াও করতে পারে না। তাই মা তাকে পেটের থলিতে নিয়ে পুরো ছয়মাস ঘুরে বেড়ায়। এরপর সে একটু একটু করে বাইরে যাওয়া শুরু করলেও আবার ফিরে আসে মায়ের থলেতে। এভাবে সব মিলিয়ে প্রায় এক বছর থাকার পরে সে পুরোপুরি বাইরের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। এরপর সে বেঁচে থাকার কৌশল এবং শিকার করার সব কায়দা শিখে নেয় তার মায়ের কাছ থেকে।

টিয়া: পাখি হিসেবে টিয়ার ছানাগুলো অতটা সুন্দর নয়। তবুও মা টিয়া সবসময় তার ছানাকে আদরে রাখে। অন্যান্য মা পাখির সঙ্গে মা টিয়ার পার্থক্য

হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই ছানারা একটু বড় হয়ে উঠার পরে বাবা মা তাদের ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু মা টিয়া এমনটা করে না। বরং সে সারাজীবন তার সন্তানদের রাখতে পারে, এমনকি তাদের খাওয়াতেও পারে।

কালো ভল্লুক: তীব্র শীতকালে কালো ভল্লুকের বাচ্চা হয় ততক্ষণে মা তার বাচ্চার জন্য গুহার ভেতর পাতা আর ডাল দিয়ে তৈরি করে বেশ গরম গরম বাসা। মা ভাল্লুকের বাচ্চাগুলো হয় হালকা পাতলা, ওজন কখনও হয় এক পাউন্ডেরও কম। শরীর বেশ সুন্দর লোমে ঢাকা হলেও সেগুলো তাদেরকে শীতের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। তাই মা তাদেরকে সবসময় নিজের শরীরের নিচে ঢেকে রাখে। শীত শেষ হয়ে বসন্ত আসতে আসতেই বাচ্চারা বেশ বড়ো হয়ে যায়। এতটাই বড়ো হয় যে তারা গাছে ওঠাও শিখে যায়। সেটা অবশ্য তাদের মা শেখায়।

পান্ডা: পান্ডার যখন বাচ্চা হয়, তখন সেটা এতই ছোটো থাকে যে, হিসেব করলে দেখা যায় মা, তার সন্তানের থেকে ৯০০ গুণ। একে তো বাচ্চা ছোটো, তার উপর আবার প্রথমদিকে চোখ ফোটে না। পান্ডার সবচে বড় শত্রু হচ্ছে চিতাবাঘ এবং বুনো কুকুর। মা পান্ডা তাই সবসময় তার বাচ্চাদের খেয়ালে রাখে। বয়স যখন তার হয় সাত মাস, তখন তার মা তাকে বাসার বাইরে নিয়ে আসে।

ঘোড়া: ঘোড়ার বাচ্চাগুলোর পা হয় বেশ ল্যাকপ্যাকে। এর কারণ সেগুলো তার শরীরের তুলনায় বড়। তাই জন্মাবার পর সে ঠিকমতো দাঁড়াতে পারে না। তার মা তাকে ঠিকমতো দাঁড়ানো শেখায়, হাঁটতে শেখায়। এই শেখানোর গতি এতটাই বেশি যে, ছানাটি কয়েক ঘন্টার মধ্যেই জোরেশোরে ছুটতে শুরু করে। দৌড় না শিখেই বা কী করবে, দৌড় না দিলে বাঘ সিংহ এসে তাদের খেয়ে ফেলবে যে! তাই মা তাকে আগেভাগে দৌড় দেয়াটাই শেখায়।





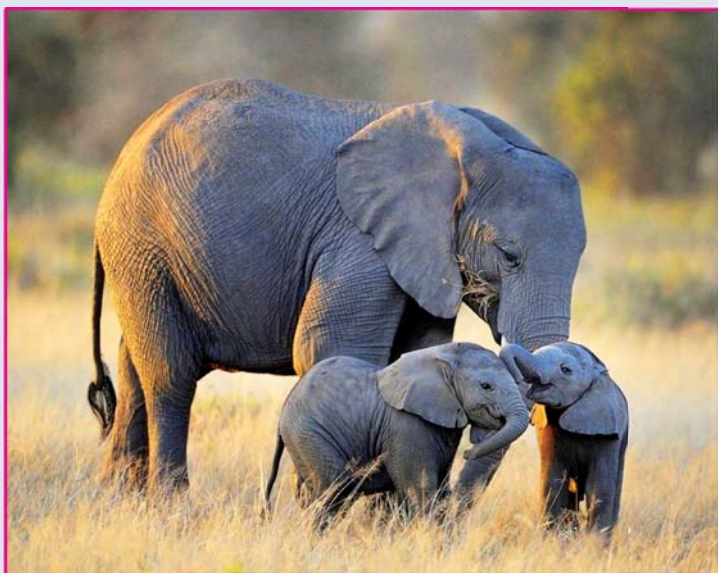

হাতি: পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো এবং বেশি ওজনের বাচ্চা জন্ম দিয়ে থাকে হাতি। হাতির একটি বাচ্চার ওজন দু'শো থেকে আড়াইশো পাউন্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে।হাতির বাচ্চা শুরুতে অন্ধ হয়ে জন্ম নেয়। ফলে চলাচল এবং পরিবেশ বুঝে উঠতে নিজের শরীর আর মায়ের ওপরই ভরসা করতে হয়। কিন্তু হাতির বাচ্চাগুলো বেড়ে ওঠে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে। ফলে কোনো হাতি বাচ্চা জন্ম দিলে সম্পর্কে নানি, দাদি, চাচিরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ছোটো বাচ্চাকে লালন-পালনে সব ধরনের সহযোগিতা করে থাকে তারা।

মেরু ভালুক: সন্তান ধারণের জন্য মা মেরু ভালুককে বেশ কিছু বিষয় মেনে নিতে হয়। প্রথমত তাকে প্রায় চারশো পাউন্ডের বেশি ওজন অর্জন করতে হয়। তারপর তাকে প্রায় কয়েকমাস না খেয়ে থাকতে হয়। এর সবই করতে হয় শুধুমাত্র সুস্থ-সবল বাচ্চা জন্ম দেয়ার জন্য। মা ভালুকটি গর্ভধারণকালে গর্ত খোঁড়ে শীতযাপন করে। জন্মের সময় বাচ্চার ওজন হয়ে থাকে মাত্র এক পাউন্ডের মতো। এসময়ের মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রার মধ্যে মা ভালুক তার শরীরের তাপমাত্রায় সন্তানকে উষ্ণ রাখে। তীব্র শীতে গর্তে থাকা অবস্থায় মা ভালুক না খেয়েই দিন কাটায়। মা নিজে উপোস থেকেও সন্তানকে দুধ খাইয়ে সুস্থ রাখে। বলে রাখা ভালো, বাবা ভালুকে এরই মাঝে তাদের ছেড়ে চলে যায়। তখন মা ভালুক একাই তার সন্তানের লালন পালন করে। যতদিন পর্যন্ত না বাচ্চারা গর্তের বাইরে গিয়ে টিকে থাকার উপযুক্ত হয়। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় টিকে থাকার কৌশল শেখাতে মা তার বাচ্চাদেরকে প্রায় দুই বছর ধরে কাছে রাখে।

চিতা বাঘ: মা চিতাকে একাই বাচ্চার দেখভাল করতে হয়। বাঘ হিংস্র প্রাণী হলেও এদের বাচ্চারা টিকে থাকার জন্য কোনো ধরনের কৌশলই জানে না। অন্য শিকারি প্রাণী যেমন- সিংহ, হায়নার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মা চিতা প্রতি চারদিন পরপর বাচ্চাদের নতুন নতুন জায়গায় স্থানান্তর করে, যেন শিকারিরা বাচ্চাদের গায়ের গন্ধ আন্দাজ করতে না পারে।বাচ্চা স্থানান্তরের এই কাজটি সন্তানের প্রতি মায়ের তীব্র ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। শিকার ধরার কৌশল শেখাতে মা চিতার প্রায় দুই বছর লেগে যায়। চিতা বাঘ অন্য মাতৃহীন বাচ্চাও লালন পালন করে।

ওরাংওটাং: মা ও তার সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধনগুলোর একটির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ওরাংওটাং। জন্মের প্রথম দুই বছর খাদ্য এবং চলাচলের জন্য বাচ্চা ওরাংওটাং পুরোপুরি তার মায়ের উপর নির্ভর করে। ছয় থেকে সাত বছর পর্যন্ত মা তার সন্তানের দেখভালই শুধু করে না; বরং কীভাবে খাবার খুঁজতে হয় এবং কীভাবে খেতে হয়, কীভাবে ঘুমানো জন্য আবাস তৈরি করতে হয়— এসবের প্রশিক্ষণও দেয়। মা তার জীবদ্দশায় অর্ধেকটা সময় গাছের উপরই কাটিয়ে দেয়।সন্তানের জন্য প্রতি রাতেই ঘুমানোর আবাস তৈরি করে দেয়। এভাবে একজন মাকে তার জীবদ্দশায় প্রায় ত্রিশ হাজারের মতো আবাস তৈরি করতে হয়। মা তার সন্তানকে প্রায় সবসময়ই নিজের শরীরের সাথে যুক্ত করে রাখে। প্রায় পাঁচ বছর পর্যন্ত মা তার সন্তানকে নিজে বহন করে এবং আট বছর পর্যন্ত বুকের দুধ পান করায়।

পেঙ্গুইন: ডিম পাড়ার পর মা পেঙ্গুইনটি ডিমটি একটি পুরুষ পেঙ্গুইনের কাছে রেখে যায়, যেন প্রতিকূল পরিবেশ থেকে ডিমের ভঙ্গুর ও শক্ত খোসাটিকে রক্ষা করে। এরপর মা পেঙ্গুইনটি ছানাদের জন্য মাছ ধরতে সমুদ্রের কাছে পৌঁছাতে প্রায় ৫০ মাইল পর্যন্ত ভ্রমণ করে। মা পেঙ্গুইন যখন মাসখানেক পর সমুদ্র থেকে ফিরে আসেন, তখন হাজার হাজার পেঙ্গুইনের কলোনির ভেতর থেকেও নিজস্ব ডাকের মাধ্যমে ঠিক নিজের বাচ্চাকে খুঁজে বের করেন। পরে সে ডিম ফোটার জায়গায় ফিরে এসে সদ্য ফোটা ছানাদের জন্য খাবার ঢেলে দেয় দেয়। নিজের ডিমের থলির উষ্ণতা ব্যবহার করে মা পেঙ্গুইনটি ছানাদের উষ্ণ আর নিরাপদ রাখে। ❑

প্রাবন্ধিক





মায়ের যত ত্যাগ

ইসমত আরা

মানুষ হোক বা কোনো প্রাণী হোক সবার ক্ষেত্রেই পৃথিবীতে সব থেকে নিরাপদ আশ্রয় হচ্ছে তার মায়ের কোল। সবচেয়ে মধুর ডাক মা। প্রাণীদের মধ্যে আবার এমন কিছু ত্যাগী প্রাণী রয়েছে যারা সন্তানদের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে পৃথিবীতে বংশধরদের রেখে যায়। এদের মধ্যে দুটি প্রাণী হলো অক্টোপাস ও মাকড়সা।

অক্টোপাস : অক্টোপাস ডিম পাড়ার সময় হলে উপযুক্ত পরিবেশ বুঝে পেট থেকে সমস্ত ডিম পানিতে ছেড়ে দেয়। বন্ধুরা, তোমরা জেনে অবাক হবে যে, একটি অক্টোপাস এক সঙ্গে প্রায় ৫৬ হাজার ডিম পাড়তে পারে। আরো বিস্ময়কর খবর হলো-ডিম পাড়ার পর থেকে অক্টোপাস বেশ কয়েক মাস কোনো রকম খাবার খায় না। পানির তলায় নুড়ি পাথর ঘেরা সুরক্ষিত গুহার মধ্যে ডিম পাড়ে অক্টোপাস। ডিম পেড়ে অক্টোপাস সেই গুহার সামনেই শুয়ে থাকে এবং সেখানে সাইফনের সাহায্যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এর ফলে ক্ষতিকর কোনো কিছুর প্রভাব পড়তে পারে না সে ডিমের ওপর। ডিমের মধ্যে যাতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে তার ব্যবস্থাও করে রাখে। শিকারিরা কোনো কারণে কাছাকাছি এলে তার শুঁড়ের সাহায্যে নিঃশব্দে আঘাতও করে অক্টোপাস। বছরের অর্ধেকের বেশি সময় অক্টোপাস তার ছানাদের জন্য ব্যয় করে। আর এই সময়টায় সে কিছুই খায় না। এর ফলে আনাহারে পেটে ডিম নিয়ে অনেক অক্টোপাসের মৃত্যুও হয়।

মাকড়সা : প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ মা বলা যায় মাকড়সাকে। কারণ যখন মাকড়সার ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় তখন মা মাকড়সা সেই ডিম নিজের দেহে বহন করে বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত। যখন বাচ্চা হয় তখন মা মাকড়সা বাচ্চাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজের শরীর বিলিয়ে দেয় তাদের খাবারের জন্য। বাচ্চা মাকড়সারা খাদ্য হিসেবে মা মাকড়সার শরীরই খেতে শুরু করে একটু একটু করে। সন্তানের জন্য মা নীরবে হজম করে সব কষ্ট যন্ত্রণা। এভাবে এক সময় মায়ের পুরো শরীরই চলে যায় সন্তানদের পেটে। ❑

প্রাবন্ধিক

মাকে নিয়ে উক্তি

রায়হান সাইফুর চৌধুরী

‘মা কথাটি ছোট্ট অতি কিন্তু জেনো ভাই, ইহার চেয়ে নাম যে মধুর ত্রিভূবনে নাই।’

ছোট্ট একটি শব্দ ‘মা’, অথচ এই ছোট্ট শব্দটির গভীরতা ব্যাপক এবং এর বিশালতা আকাশ ছোঁয়া। সন্তানের কাছে তার পৃথিবী হচ্ছে মা। মা শাশ্বত, চিরন্তন একটি আশ্রয়ের নাম। মা শব্দটি মনে করিয়ে দেয় অকৃত্রিম স্নেহ, মমতা আর গভীর ভালোবাসার কথা। তাই তো এখন সারা বিশ্বে দিবসটি পালিত হয় মায়ের প্রতি সন্তানের অকৃত্রিম ভালোবাসা আর গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে। একটা সময় ছিল বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে দিবসটি পালিত হতো না, তবে কয়েক বছর ধরে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর মতো আমাদের দেশেও মে মাসের দ্বিতীয় রোববার দিবসটি পালনের রেওয়াজ শুরু হয়েছে। মা দিবসের মূল উদ্দেশ্য, মাকে যথাযথ সম্মান দেয়া।

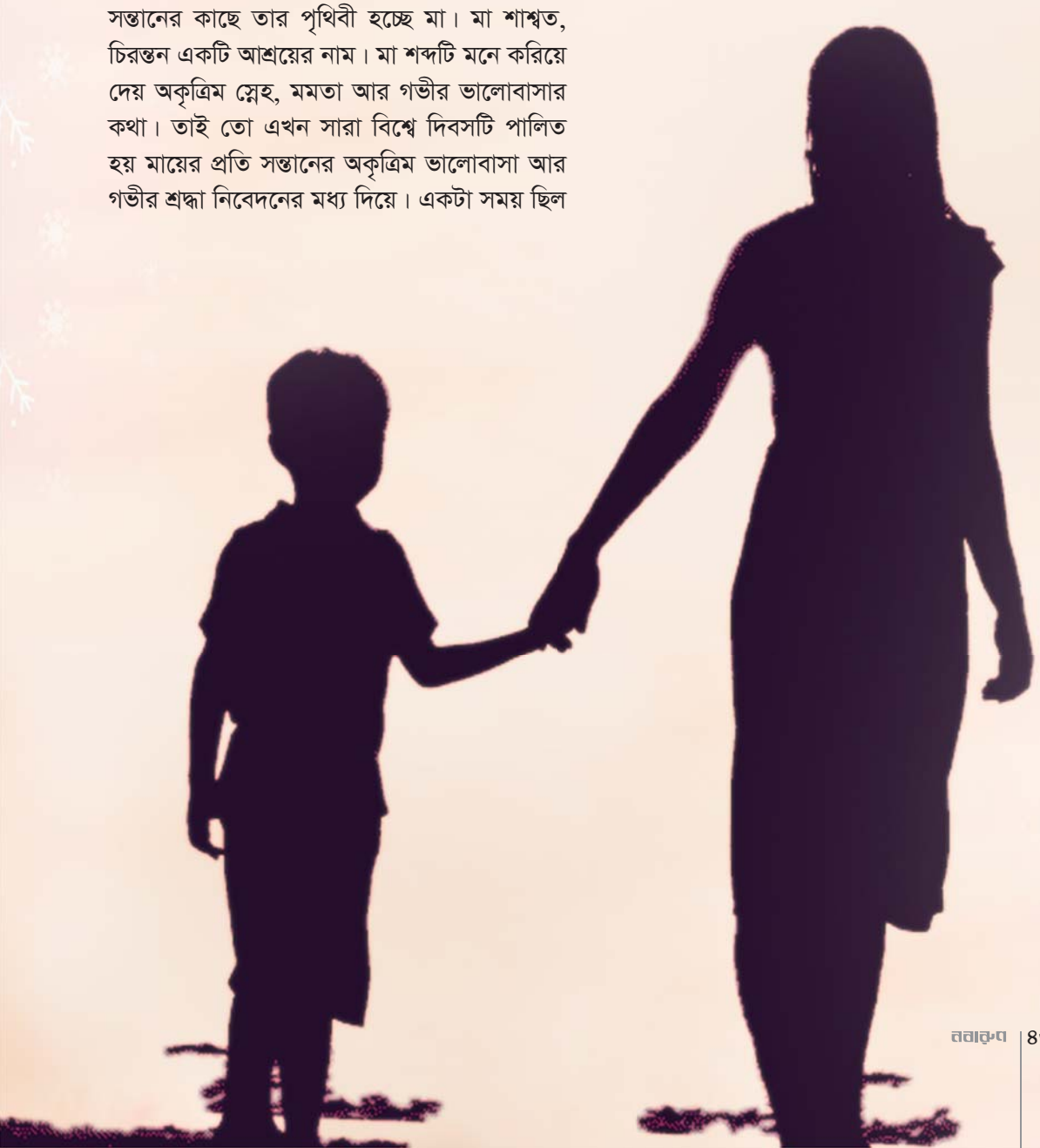

বয়স যতই হোক না কেন মায়ের কাছে সন্তান সবসময়ই ভালোবাসার। আবার সন্তানের কাছেও মা সবসময় শ্রদ্ধার, ভালোবাসার। আর এই ভালোবাসার মাকে নিয়েই মণীষীগণ নানান রকমের উক্তি দিয়েছেন, মায়ের প্রতি সন্তানের ভালবাসার এসব উক্তি যুগ যুগ ধরে সবার কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। আর এসব উক্তিই মায়ের ত্যাগ, মমত্ব সব কিছু প্রকাশ করেছে।

চলো জেনে নেই মা সম্পর্কে কিছু উক্তি-

- যার মা আছে, সে কখনোই গরিব নয়
[মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন]
- আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দরি আমার মা। মায়ের কাছে আমি চিরঋণী। আমার জীবনের সমস্ত অর্জন তারই কাছ থেকে পাওয়া নৈতিকতা, বুদ্ধিমত্তা আর শারীরিক শিক্ষার ফল।
[প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন]
- আমার মা মনে করেন আমিই সেরা আর মা মনে করেন বলেই আমি সেরা হয়ে গড়ে উঠেছি
[আর্জেন্টিনার সাবেক ফুটবলার দিয়াগো ম্যারাডোনা]
- আমার বসার ঘরের দেয়ালে আমার মায়ের ছবি টাঙানো আছে। কারণ তিনিই আমার কাছে সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ
[এলেন ডে জেনেরিস]
- আমার মা বিস্ময়কর আর আমার কাছে উৎকৃষ্টের আরেক নাম [পপ সম্রাট মাইকেল জ্যাকসন]
- মায়ের ভালোবাসা এতটাই শক্তিশালী যে এটি সব সময় নিজের চিহ্ন রেখে যায়। এত বেশি গভীর আর শক্তিধর সেই ভালোবাসা, যা সারা জীবন সুরক্ষা কবজের মতো আমাদের ঘিরে থাকে
[হ্যারিপটার সিরিজের রচয়িতা জেকে রাউলিং]
- তুমি আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি দেব [নেপোলিয়ন বোনাপার্ট]
- একজন মায়ের বাহু কোমলতা দিয়ে তৈরি, এবং শিশুরা তাদের মধ্যে সুন্দরভাবে ঘুমায়
[ভিক্টর হুগো]
- কোনো একটা বিষয় মায়েদেরকে দুইবার ভাবতে হয়। একবার তার সন্তানের জন্য, আরেকবার নিজের জন্য। [সোফিয়া লরেন]
- আমাদের পরিবারে মায়ের ভালোবাসা সবসময় সবচেয়ে টেকসই শক্তি। আর তার একাগ্রতা, মমতা আর বুদ্ধিমত্তা আমাদের মধ্যে দেখে আনন্দিত হই।
[মিশেল ওবামা, আমেরিকান আইনজীবী ও লেখক]
- মা যেমন তাঁর নিজ পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করে তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে। [গৌতম বুদ্ধ]
- মায়ের হৃদয় হচ্ছে এক গভীর আশ্রয়, সেখানে আপনি সহজেই খুঁজে পাবেন মমতার সুশীতল ছায়া।' জন গে বলেছেন, 'মা, মা-ই, তার অন্য কোনো রূপ নেই। [ঔপন্যাসিক বালজাক]
- মাতৃত্বেই সব মায়া-মমতা ও ভালোবাসার শুরু এবং শেষ। [ব্রাউনিং]
- আমার মা কেবল একজন 'ফুলটাইম মা-ই ছিলেন। তাঁর নিজের ক্যারিয়ার, নিজের অভিজ্ঞতা, নিজের জীবনের সব ঢেলে দিয়েছেন সন্তানের জন্য। আমি কখনো আমার মায়ের মতো হতে পারব না। তাঁর মাধুর্য, উদারতা, ভালোবাসা আমার চেয়ে অনেক বড়ো।
[অ্যাঞ্জেলিনা জোলি]

জন্ম থেকে শুরু করে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার যে প্রক্রিয়া পুরোটাই করেন মা। আর তাই তো মায়ের যোগ্য সন্তানেরা মা নিয়ে উক্তি দিয়েছে বিভিন্ন সময়। আর এসব উক্তিগুলো থেকে অনুভব করা যায় মায়ের ত্যাগ, মমতার। ❑

প্রাবন্ধিক

আগামীর কারিগর

তৌফিক ইলাহী সাব্বির

শিশুর হাতে বইটি দাও,
শ্রমের বোঝা আর না চাপাও।
খেলার মাঠে হাসুক তারা,
স্বপ্ন বুনুক সুন্দর ধরা।

কলম খাতা বন্ধু হোক,
জ্ঞান-আলোয় জীবন লোক।
কারখানাতে নয় যে স্থান,
বিদ্যালয়েই হোক অভিযান।

শিশু-কিশোর দেশের আশা,
তাদের ঘিরেই সুখের ভাষা।
আজকের তারা ছোট্ট প্রাণ,
আগামী দিনের মহীয়ান।

অষ্টম শ্রেণি, বিষ্ণু প্রসাদ (বিপি) সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, পঞ্চগড় সদর

শিশুর অধিকার

রাহাত হোসেন রিগান

ছোট্ট হাতে বইয়ের ঘ্রাণ
এটাই হোক শিশুর প্রাণ
ভোরের আলো, স্কুলের ঘর
সেখানেই থাকুক দিনভর।

ইট ভাঙা আর কঠিন কাজ
শিশুর জন্য নয় তো আজ
গল্প, ছড়া, নতুন গান
শেখার মাঝেই হোক সমাধান।

দেশের সকল বড়ো স্বপ্ন
শিশুর মনে জাগাবো সবে
ডাক্তার হবে, শিক্ষক হবে,
দেশের সেবায় কাজে রবে।

একাদশ, মিরপুর বাংলা কলেজ, ঢাকা

শ্রমের মর্যাদা

লোকমান হোসেন শিফাত

মে দিবসের ডাক শুনে
জাগে আশা ক্ষণে ক্ষণে
শ্রমিক যারা কাজে ব্যস্ত,
তাদের জীবন বড়োই কষ্ট।

তবু তারা থেমে না যায়,
দেশের জন্য কাজ করে যায়।
সেতু, স্কুল, হাসপাতাল,
শ্রমিক গড়ে সকাল-বিকাল।

ন্যায় ও সত্য রাখি মনে,
ভালোবাসা দিই সবার সনে।
শিশুরা আজ শপথ করি,
অন্যায়ের সাথে লড়াই করি।

শ্রমিক যেন হাসতে পারে,
শপথ হউক সবার তরে।

দশম শ্রেণি, গাবতলী মুক্তিযোদ্ধা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, গাবতলী, বগুড়া



মে দিবসে শেখা নতুন পাঠ

মিজানুর রহমান মিখুন

মানুষের ইতিহাস মূলত তার পরিশ্রম, মেধা এবং সৃষ্টিশীলতার ইতিহাস। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ তার জীবনকে সহজ ও উন্নত করার জন্য নানা উপায় খুঁজে বের করেছে। কখনো আগুন আবিষ্কার, কখনো চাকা, আবার কখনো মেশিন- এসবের মাধ্যমে মানুষ ধীরে ধীরে সভ্যতার শিখরে পৌঁছেছে। এই উন্নয়নের পথে শিল্পবিপ্লবগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। প্রথম শিল্পবিপ্লবে মানুষ হাতে চালিত কাজের পরিবর্তে যন্ত্র ব্যবহার শুরু করে। দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবে বিদ্যুৎ এসে শিল্পকে আরও গতিশীল করে তোলে। তৃতীয় শিল্পবিপ্লবে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি মানুষের জীবনকে আমূল পরিবর্তন করে দেয়। আর এখন আমরা প্রবেশ করেছি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে, যেখানে প্রযুক্তি শুধু মানুষের সহায়ক নয়, অনেক ক্ষেত্রে মানুষের জায়গা দখল করতেও শুরু করেছে।

এই নতুন যুগে আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবট, ইন্টারনেট অব থিংস, ক্লাউড কম্পিউটিংসহ নানা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি। এসব প্রযুক্তি আমাদের কাজকে দ্রুত, সহজ এবং নির্ভুল করে তুলছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আগে একটি কারখানায় শত শত শ্রমিকের প্রয়োজন হতো, কিন্তু এখন অনেক কাজ রোবট দিয়েই করা সম্ভব হচ্ছে। একইভাবে অফিসের অনেক কাজ এখন কম্পিউটার সফটওয়্যার দিয়ে সম্পন্ন করা যায়। এতে উৎপাদনশীলতা যেমন বেড়েছে, তেমনি সময়ও বাঁচছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকদের জন্য নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে।

এখানেই আসে মে দিবসের গুরুত্ব। মে দিবস শুধু একটি দিন নয়, এটি শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের এক ঐতিহাসিক স্মৃতি। ১৮৮৬ সালের ১লা মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে শ্রমিকরা দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। তখন তাদের ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য করা হতো, যা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর ও অমানবিক। শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাস্তায় নেমে আসেন। হে মার্কেট স্কয়ারে এক বিক্ষোভে



পুলিশের গুলিতে বহু শ্রমিক প্রাণ হারান। এই ঘটনা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পায়। আজও এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, শ্রমিকদের অধিকার সহজে পাওয়া যায়নি, বরং ত্যাগ ও সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে।

বর্তমান সময়ের চতুর্থ শিল্পবিপ্লব শ্রমবাজারে বড়ো ধরনের পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আগে যে কাজগুলো মানুষ করত, এখন তার অনেকটাই মেশিন বা সফটওয়্যার দিয়ে করা সম্ভব হচ্ছে। যেমন- ডাটা এন্ট্রি, হিসাবরক্ষণ, এমনকি কিছু গ্রাহকসেবার কাজও এখন স্বয়ংক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে নতুন ধরনের কাজও তৈরি হচ্ছে, যেমন- ডাটা সায়েন্টিস্ট, সফটওয়্যার ডেভেলপার, সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি। কিন্তু এসব কাজের জন্য বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন, যা সবার কাছে সহজলভ্য নয়।

এই পরিবর্তনের ফলে সমাজে একটি বৈষম্য তৈরি হতে পারে। যারা প্রযুক্তি সম্পর্কে জানে এবং নতুন দক্ষতা অর্জন করতে পারে, তারা দ্রুত উন্নতি করছে। আর যারা সেই সুযোগ পাচ্ছে না, তারা পিছিয়ে পড়ছে। ফলে ধনী ও গরিবের মধ্যে পার্থক্য আরও বাড়তে পারে। এটি একটি বড়ো সামাজিক চ্যালেঞ্জ।

অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির ব্যবহারও এই যুগের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য। অনেক কারখানায় এখন রোবট ব্যবহার করা হচ্ছে, যা মানুষের চেয়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে কাজ করতে পারে। এতে উৎপাদন বাড়লেও মানুষের কাজের সুযোগ কমে যাচ্ছে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের শ্রমিকরা এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাদের অনেকেই নতুন কাজ খুঁজে পাচ্ছেন না, ফলে বেকারত্ব বাড়ছে। এটি শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, বরং সামাজিক সমস্যাও তৈরি করতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দক্ষতা উন্নয়ন। বর্তমান যুগে টিকে থাকতে হলে সবাইকে নতুন কিছু শিখতে হবে। শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, বরং প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করা জরুরি। কম্পিউটার ব্যবহার, ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার, প্রোগ্রামিং বা অন্যান্য কারিগরি দক্ষতা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজীবন শেখার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে, কারণ প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 'গিগ ইকোনমি'। এখন অনেক মানুষ স্থায়ী চাকরির বদলে ফ্রিল্যান্স বা চুক্তিভিত্তিক কাজ করছে। যেমন- অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং, রাইড শেয়ারিং, ডেলিভারি সার্ভিস ইত্যাদি। এতে কাজের স্বাধীনতা থাকলেও নিরাপত্তা কম থাকে। অনেক সময় এসব কর্মীরা স্বাস্থ্যসেবা, পেনশন বা অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। ফলে তাদের জীবন অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। তাই এই খাতের জন্য সঠিক নীতিমালা তৈরি করা প্রয়োজন।

প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি বিষয় সামনে এসেছে, তা হলো ডিজিটাল নজরদারি। অনেক প্রতিষ্ঠান এখন কর্মীদের কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। এতে কাজের গতি বাড়লেও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা হুমকির মুখে পড়ছে। কর্মীরা অনেক সময় মানসিক চাপ অনুভব করেন, যা তাদের কাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই এই বিষয়েও সঠিক নিয়ম ও আইন থাকা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে তৈরি পোশাক শিল্প অর্থনীতির একটি বড়ো অংশ। এই খাতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ করেন। যদি এই খাতে ব্যাপকভাবে অটোমেশন চালু হয়, তাহলে অনেক শ্রমিক কাজ হারাতে পারেন। তাই এখন থেকেই তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং নতুন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ তৈরি করা জরুরি। সরকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সরকারের দায়িত্ব হলো শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এজন্য শ্রম আইন বাস্তবায়ন, সামাজিক

নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রযুক্তি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা যায়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোরও দায়িত্ব আছে। তারা শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে এবং ন্যায্য মজুরি প্রদান করতে পারে।

অন্যদিকে শ্রমিকদেরও সচেতন হতে হবে। তাদের নিজেদের উন্নয়নের জন্য নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করতে হবে। প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সংগঠিত হয়ে কাজ করলে তারা নিজেদের অধিকার আরও ভালোভাবে আদায় করতে পারবেন।

বর্তমান সময়ে মে দিবসের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। আগে শ্রমিকরা কাজের সময় কমানোর জন্য আন্দোলন করতেন, আর এখন তাদের লড়াই নতুন চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে। প্রযুক্তির এই যুগে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। তাই মে দিবস আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়, কীভাবে আমরা শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারি।

ভবিষ্যতের পৃথিবী হবে প্রযুক্তিনির্ভর। সেখানে মানুষ এবং মেশিন একসঙ্গে কাজ করবে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হলে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। দক্ষতা উন্নয়ন, সঠিক নীতিমালা এবং সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই পরিবর্তনকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব।

সবশেষে বলা যায়, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আমাদের জন্য যেমন নতুন সুযোগ তৈরি করেছে, তেমনি কিছু চ্যালেঞ্জও নিয়ে এসেছে। এই পরিবর্তনশীল বিশ্বে শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। মে দিবস আমাদের সেই দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করেই আমরা একটি সুন্দর, ন্যায়ভিত্তিক এবং উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে পারি। ❑

সিনিয়র সহ-সম্পাদক, জাগো নিউজ২৪.কম





ভূমিকম্পের তিন সেকেন্ড আগে

তানভীর হোসেন

রাফির বয়স চৌদ্দ। সে খুব সাধারণ একটা ছেলে। ক্লাসে মাঝামাঝি রোল, ক্রিকেট খেলতে পারে না, আর অঙ্ক দেখলে মাথা ব্যথা করে। কিন্তু তার একটা সমস্যা ছিল।

ভূমিকম্প হওয়ার ঠিক তিন সেকেন্ড আগে সে টের পেত।

প্রথমবার ঘটনাটা ঘটে এক বর্ষার রাতে। রাফি পড়ার টেবিলে বসেছিল। হঠাৎ তার বুকের ভেতর কেমন ধক করে উঠল। মনে হলো মেঝের নিচে কেউ বিশাল একটা ঢোল বাজালো।

এক দুই তিন

তারপর পুরো ঘর কেঁপে উঠল।

আলমারি দুলছে। জানালার কাচ কাঁপছে। রান্নাঘর থেকে প্লেট ভাঙার শব্দ এল।

রাফি এত ভয় পেয়েছিল যে কথা বলতে পারেনি।

কিন্তু এরপর ঘটনাটা বারবার হতে লাগল।

স্কুলে। বাসে। মার্কেটে।

প্রতিবার ভূমিকম্পের ঠিক তিন সেকেন্ড আগে তার বুকের ভেতর সেই অদ্ভুত কম্পন উঠত।

প্রথমে কেউ বিশ্বাস করেনি।

তার মা বললেন, তুই বেশি মোবাইল দেখিস। তাই এই অবস্থা হয়।

বন্ধুরা হাসল। মুসা বলল, তুই সুপারহিরো নাকি?

রাফি আর কাউকে কিছু বলত না।

কিন্তু একদিন স্কুলে বড়ো ঘটনা ঘটল।

সকালের অ্যাসেম্বলিতে সবাই মাঠে দাঁড়িয়ে। হেডস্যার বক্তৃতা দিচ্ছেন। রাফি হঠাৎ সেই অনুভূতিটা পেল।

ধক।

তার বুক ঠান্ডা হয়ে গেল।

সে চিৎকার করে উঠল, 'ভূমিকম্প! সবাই নিচু হন'!

পুরো মাঠ হাসিতে ফেটে পড়ল।

কেউ নড়ল না।

এক দুই তিন.

হঠাৎ মাটি কেঁপে উঠল।

স্কুল বিল্ডিং দুলে উঠল। ছাদের একটা অংশ ভেঙে পড়ল করিডোরে। সবাই চিৎকার শুরু করল।

কিন্তু মাঠে থাকা ছাত্ররা নিরাপদ ছিল।

সেদিনের পর কেউ আর রাফিকে নিয়ে হাসেনি।

বরং সবাই তাকে অদ্ভুত চোখে দেখত।

রাফির এটা ভালো লাগত না। সে বিশেষ কেউ হতে চায়নি। শুধু স্বাভাবিক থাকতে চেয়েছিল।

একদিন বিজ্ঞান স্যার তাকে আলাদা করে ডাকলেন।

'তুমি জানো ভূমিকম্প কেন হয়'?

রাফি মাথা নাড়ল।

স্যার কাগজে পৃথিবীর ছবি আঁকলেন।

'পৃথিবীর নিচে বিশাল টেকটোনিক প্লেট আছে। এগুলো সব সময় নড়াচড়া করে। যখন চাপ জমে যায়, তখন হঠাৎ শক্তি বের হয়। তখনই ভূমিকম্প।'

রাফি চুপচাপ শুনছিল।

স্যার বললেন, 'বিজ্ঞানীরা আগেভাগে ভূমিকম্প বুঝতে চেষ্টা করেন। কিছু প্রাণীও আগে টের পায়। হয়ত তোমার শরীর খুব সূক্ষ্ম কম্পন ধরতে পারে।'

'কিন্তু মাত্র তিন সেকেন্ড আগে,' রাফি বলল।

স্যার হেসে বললেন, 'কখনো কখনো তিন সেকেন্ডই জীবন বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট।'

সেদিন কথাটা রাফির মাথায় গেথে গেল।

এরপর থেকে সে শুধু ভয় পেত না। শিখতে শুরু করল।

ভূমিকম্প হলে কী করতে হয় :

- টেবিলের নিচে আশ্রয় নিতে হয়
- লিফট ব্যবহার করা যায় না
- জানালা থেকে দূরে থাকতে হয়
- খোলা জায়গায় যেতে হয়

সে বন্ধুদেরও শেখাতে লাগল।

তারপর এল সেই দিনটা।

বিকেলে কোচিং সেন্টারে পরীক্ষা চলছিল। চারতলা বিল্ডিং। প্রায় দেড়শ ছাত্র।

রাফি অঙ্ক লিখছিল। হঠাৎ তার বুকের ভেতর সেই পরিচিত কম্পন উঠল।

ধক।

তার হাত ঠান্ডা হয়ে গেল।

সে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, 'সবাই ডেস্কের নিচে যান! এখনই!'

স্যার রেগে গেলেন। 'রাফি, বসো!'

কিন্তু রাফি এবার থামল না।

'স্যার, প্লিজ!'

তার কণ্ঠ কাঁপছিল।

এক. দুই. তিন.

ভয়ংকর শব্দে পুরো বিল্ডিং কেঁপে উঠল।

ফ্যান দুলছে। লাইট নিভে গেল। ছাদের প্লাস্টার ভেঙে পড়তে লাগল।

কিন্তু বেশিরভাগ ছাত্র তখন ডেস্কের নিচে।

ভূমিকম্প থামার পর বাইরে বেরিয়ে সবাই হাঁপাচ্ছিল। কেউ কাঁদছে, কেউ ফোন করছে।

রাফি দেয়ালের পাশে বসেছিল। তার হাত কাঁপছিল।

বিজ্ঞান স্যার এসে তার কাঁধে হাত রাখলেন।

'তুমি ভয় পেয়েছিলে?'

রাফি ধীরে মাথা নাড়ল।

স্যার বললেন, 'সাহস মানে ভয় না পাওয়া না। ভয় পেয়েও ঠিক কাজটা করা।'

সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় আকাশটা অদ্ভুত শান্ত ছিল। বাতাসে ধুলোর গন্ধ।

রাফি হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, তার তিন সেকেন্ডের ক্ষমতাটা হয়ত কোনো জাদু না।

হয়ত এটা শুধু একটা দায়িত্ব। ❑

চতুর্থ বর্ষ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা



গরু গবেষক গুলজার মামা

জুয়েল আশরাফ

আমার মামা গুলজার মামা, একজন অদ্ভুত মানুষ। আমি বলতে পারি, তিনিই পৃথিবীর একমাত্র লোক যিনি ঈদের আগে গরুর চোখের ভাষা বোঝার চেষ্টা করেন। তিনি নিজেই নিজের নাম দিয়েছেন 'গরু গবেষক গুলজার'। আমাদের বাড়ির সামনে দেয়ালে বড়ো করে কালি দিয়ে লিখে রেখেছেন- গুলজার গরু গবেষণাগার (গ.গ.গ.) গরু দেখুন, ভাবুন, বুঝুন।

নানাজান রেগে গিয়ে কয়েকবার ওই লেখায় চুন মাখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিবারই মামা নতুন কালি দিয়ে আবার লিখে দেন।

ঈদ আসছে। পুরো পাড়া গরুতে গরুতে সয়লাব। কারোটা সাদা, কারোটা কালো, কারোটা আবার জেব্রার মতো ডোরাকাটা। কিন্তু আমাদের বাড়ির উঠানে এখন গরু নেই। কারণ গুলজার মামার 'গরু গবেষণা' এখনো চলছে।

মামা বলছেন, এই বছর আমি এমন গরু আনব, যে গরু নিজেই বুঝবে, কবে কার মাথায় শিং ঠোকা দরকার!

আমার নাম তুহিন। আমি মামার সবচেয়ে কাছের মানুষ এবং গরু-গবেষণার একমাত্র শাগরেদ।

মামা বললেন, তুহিন, তুই জানিস, গরুরও আই-কিউ থাকে? মানে বুদ্ধির স্কেল?

আমি বললাম, না।

মামা চোখ ছোটো করে বললেন, এই জন্যই তো তোকে আমার সঙ্গে রাখতে হয়। আমি এই ঈদে যে গরু কিনব, সেটার আই-কিউ হবে কমপক্ষে ১২০!

আমি সন্দেহ করলাম, মামা হয়ত নিজের আই-কিউ গরুর সঙ্গে পালটে ফেলেছেন।

গরুর বুদ্ধি বোঝার জন্য মামা কিছু অভিনব পরীক্ষা চালালেন। তিন রকম কলা একটা প্লেটে রাখলেন- পাকা কলা, কাঁচা কলা, আর একটা প্লাস্টিকের কলা। তারপর গরুকে বললেন, যে বুদ্ধিমান, সে প্লাস্টিকের কলা খাবে না।

একটা গরু সব খেয়ে ফেলল। মামা বললেন, এটা হলো লোভী শ্রেণির গরু। বাতিল।

আরেকটা গরু কিছুই খেলো না। মামা বললেন, এটা হলো দার্শনিক গরু। ঈদে কোরবানির বদলে সমাজসেবায় আগ্রহী। বাতিল।

শেষমেষ এক গরু শুধু পাকা কলা খেলো। মামা তখন দুহাত তুলে বললেন, এই হচ্ছে গরু গবেষণার গৌরবময় ফলাফল! আমি একে বাড়ি নিয়ে যাব।

গরু ঘরে এল। গরুর নাম রাখা হলো 'আই-কিউ ভাই'। কিন্তু বাড়িতে আনার পর সমস্যা শুরু হলো। প্রথম দিনই মামা বললেন, তুহিন, গরুটা আজ আমার সঙ্গে চা খাবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, চা?

মামা বললেন, বুদ্ধিমান প্রাণীর চা লাগেই। আমি তো নিজেই দিনে ছয় কাপ খাই।

গরুর সামনে এক কাপ চা রাখা হলো। গরু শুঁকে নাক কুঁচকালো। মামা বললেন, দেখ, কী বুদ্ধিমত্তা! গরম চা মুখে দিল না!

পরদিন সকালে দেখি গরু আমাদের রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে পেঁয়াজ খাচ্ছে। মামা বললেন, ওর চোখে জল, কারণ সে বুঝে গেছে কুরবানি আসছে!

নানাজান তখন হুংকার দিয়ে উঠলেন, গুলজার! এইবার যদি আর একটা কথা বলিস না, তাহলে তোর আই-কিউ ভাইয়ের কুরবানি দেবো!

গরুটা একদিন পাশের বাড়ির গরুর সঙ্গে পালিয়ে গেল। মামা বললেন, তুহিন, এটা প্রেমিক শ্রেণির গরু। আমি ভুল বুঝেছিলাম। আসলে ওর আই-কিউ বেশি, তাই সে নিজের সঙ্গী খুঁজে নিয়েছে।

আমি বললাম, মামা, এখন কী করব?

মামা একগাল হাসি দিয়ে বললেন, গবেষণা বন্ধ করা যায় না। নতুন গরু কিনতে হবে। তবে এবার আমার তত্ত্ব হবে 'কম বুদ্ধির গরু, বেশি অনুগত।'

এইবার মামা একেবারে অন্য রকম গরু কিনলেন। গরুর নাম রাখলেন 'বোকা ভাই'। গরুর সামনে কলা রাখলে সে গর্তে পড়ে যায়। মামা খুশি হয়ে বললেন, দেখ! কী অনুগত, কী নিরীহ! এবার আব্বাজানও খুশি হবেন।

নানাজান সত্যিই খুশি হলেন। তিনি বললেন, এবারের গরুটা গরুর মতো গরু হইছে!

গরু ফাইনাল। গরুর মালিককে দাম দেওয়া হলো। এটাই কুরবানি হবে। আমি মামার পাশে বসে বললাম, মামা, আপনার গবেষণা কি এবার শেষ?

মামা গম্ভীর গলায় বললেন, গরুর গবেষণা কোনোদিন শেষ হয় না, তুহিন। এবার আমি কুরবানির পর গরুর স্মৃতিশক্তি নিয়ে গবেষণা করব। এই 'বোকা ভাই' কুরবানির আগে যদি বুঝতে পারে কী হচ্ছে, তাহলেই বুঝবি স্মৃতিশক্তি কতদূর যায়!

আমি মাথা চুলকে বললাম, তাহলে গরুটা যদি পালিয়ে যায়?

মামা চোখ গরম করে বললেন, তাহলেই তো গবেষণায় নতুন মোড় আসবে!

কিন্তু বোকা ভাই আর পালালো না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। মামা হতাশ হয়ে বললেন, একেবারে গরুর গরু হয়ে গেল!

আমি হাসি চেপে বললাম, মামা, এটাই তো গবেষণার সেরা প্রমাণ। বোকা ভাই পরীক্ষায় পাস করেছে!

মামা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তুই ঠিক বলেছিস, তুহিন। এবার আমি গরুর চুলের রং নিয়ে গবেষণা শুরু করব। ভাবতেছি, সাদা গরুর আই-কিউ বেশি না বাদামি গরুর?

আমি চোখ বন্ধ করে ভাবলাম, গরু কেনা তো শেষ হলো, কিন্তু গুলজার মামার গবেষণা বুঝি কোনোদিনই শেষ হবে না!

দুই

মামার বাছুর-গরু ব্যর্থতা কাটতে না কাটতেই নতুন বিপদ। গরু পালিয়ে মালিকের বাড়ি চলে গেল। মালিকের ধারণা গরুর গুলজারকে পছন্দ হয়নি। তাই গরু ফেরত না দিয়ে টাকা ফেরত দিল। নানাজান ঘোষণা দিলেন, এই বাড়ির আর কেউ গরু কিনতে যাবে না। এবার থেকে গরু আনবে 'বুঝেশুনে গরু কেনা কমিটি'। চেয়ারম্যান তুহিন, মেম্বার গুলজার।

আমি তো গর্বে আটখানা। আর মামা? তার মুখে সেই চেনা বিজয়ী হাসি। নানাজানের নির্দেশে গরুর হাটে যাব এবার আমরা দুজনেই। তবে এবার আর সোজাসাপটা যাওয়া নয়। মামার পরিকল্পনা বিশাল।

তুহিন, এবার হাটে গিয়ে তোকে শুধু মানুষ না, গরুর ভাষাও বুঝতে হবে।

আমি ভ্রু কুঁচকে বলি, গরুর ভাষা?

মামা বললেন, হ্যাঁ রে পাগল! গরুর চোখে, দাঁতে, লেজে, চোয়ালে সব খবর লেখা থাকে। যে বুঝতে পারে, সে-ই গরু গবেষক।

আমি জিজ্ঞেস করি, তুমি কী করে শিখলে গরুর ভাষা?

মামা চোখ বন্ধ করে বলেন, ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখেছিলাম। লোকটা বলছিল, গরু কিনতে গেলে শুধু গরুর দিকে তাকিও না, দেখবে গরুও তোমার দিকে তাকাবে!

আমি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ি। মামা সত্যিই সিরিয়াস।

ঈদের একদিন আগে। হাটে যাবার সকাল। মামা একটা ধবধবে সাদা জামা পরে এসেছেন, চোখে সানগ্লাস, কাঁধে একটা ছাইরঙা ব্যাগ। আমি বলি, এই ব্যাগে কী?

মামা গম্ভীরভাবে বলেন, গরু পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ সরঞ্জাম।

আমি ব্যাগে উঁকি মেরে দেখি, একটা প্লাস্টিকের দড়ি, ছোটো আয়না, একটা মোবাইল ট্রাইপড, আর দোয়াত-কলম!

এসব দিয়ে গরু কেনা হবে?

মামা চোখ টিপে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা যেমন মাঠে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে, আমরাও তাই করব। তোকে গরুর দাঁত গুনতে হবে, আমায় লেজের দোলন দেখে গরুর মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করতে হবে।

আমি হাঁফ ছাড়ি।

হাটে পা রেখেই মামা বলে ওঠেন, গরু গবেষক মাঠে নামল!

লোকজন তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। মামা এক হাতে সানগ্লাস সামলাচ্ছেন, অন্য হাতে দড়ি। আমি তার পাশে হাঁটছি গম্ভীর মুখে, যেন আমরা গোয়েন্দা না, গরু-তদন্তকারী। একজন বেপারী এগিয়ে এসে বলল, ভাই, কোন সাইজের গরু লাগবে?

মামা বললেন, প্রথমে গরুর মানসিক অবস্থা জানতে চাই। হুঁ, তোমার এই গরুর মানসিক চাপ কেমন?

বেপারী থতমত খেয়ে বলল, মানে?

মানে গরু কি আজ সকাল থেকে খেয়েছে? চোখে ক্লান্তি দেখছি।

মামা আয়না বের করে গরুর চোখে তাকান। আমি লজ্জায় মাটিতে গর্ত খুঁড়তে চাই। তারপর শুরু হয় বিশ্লেষণপর্ব। একটার পর একটা গরু দেখে মামা বলেন, এইটা চঞ্চল, এইটা অন্তর্মুখী, ওইটা মনে হয় ঈদের দিন কাঁদবে।

একটা গরুর লেজের দোলন দেখে মামা রায় দিলেন, হুঁ, খুব সুশিক্ষিত গরু। বোঝা যাচ্ছে অনেক আদরে বড়ো হয়েছে।



দুপুর গড়িয়ে বিকেল। মামা অবশেষে এক গরুর সামনে থামলেন। বললেন, এইটিই আমার দেখা শ্রেষ্ঠ গরু। দাঁত পরিপাটি, চোখে আত্মবিশ্বাস, এবং...সেলফি তুললে ভালো লাগবে।

আমি বললাম, তুমি কী গরুর সঙ্গে সেলফি তুলবে?

মামা বলল, অবশ্যই! ঈদে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, 'তোমার গরু কেমন?' আমি সেলফি দেখাবো।

অবশেষে গরু কেনা হলো। বড়ো, বাদামি, শান্ত স্বভাবের এক গরু। বাড়িতে ঢুকতেই নানাজান বেরিয়ে এলেন।

তিনি গম্ভীরভাবে গরু দেখে বললেন, এবার মনে হচ্ছে ঠিকঠাক হয়েছে।

গুলজার মামা গর্বভরে বলেন, এই গরুর নাম দিয়েছি 'গবেষণা'!

নানাজান চোখ বড়ো করে বলেন, গরুর নাম গবেষণা?

মামা বলেন, হ্যাঁ। কারণ, এই গরুর সঙ্গে আমি এক নতুন জীবনের গবেষণা শুরু করলাম।

রাতে মামাকে দেখি গরুর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, তুই আর আমি একসঙ্গে অনেক দূর যাব রে গবেষণা। তুই হবি ঈদের তারকা, আমি হব গবেষক গুলজার!

আর আমি? দূর থেকে দাঁড়িয়ে ভাবি, আমার মামা হয়ত গাধা না, তবে দারুণ একটা মানুষ। এমন মানুষ, যার সঙ্গে হাটে গেলে গরু কেনা যায় না, গল্প কেনা যায়। ❑

শিশুসাহিত্যিক

বিভিন্ন ভাষায়

মা

পৃথিবীর বুকে পদার্পণের পরেই মায়ের মমত্বের পরশ পৃথিবীর সবকিছুর ঊর্ধ্বে। নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে সন্তানকে মানুষ করার, প্রতিষ্ঠিত করার সার্বক্ষণিক চেষ্টা থাকে মায়ের। সন্তানের মঙ্গল কামনায় মা নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।



ভালোবাসার জগতে মা ও সন্তানের সম্পর্ক সত্যিকারের এক চিরন্তন বিস্ময়। মা দিবসে আরও একটি বিস্ময়কর ব্যাপার তোমাদের জানিয়ে দিই আর তা হলো– পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায়ই 'মা' শব্দটি ধ্বনি 'ম' দিয়ে শুরু অথবা শব্দটির মাঝে 'ম' ধ্বনি আছে। পৃথিবীর সব দেশের শিশুর প্রথম ভাষা 'মা'। মা শব্দের কোনো বিকল্প নেই। নানা ভাষায় মা সর্বোত্তম শ্রুতিমধুর একটি শব্দ। কিন্তু মা ডাকটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। আসুন জেনে নিই বিশ্বের কয়েকটি দেশের মা ডাক সম্পর্কে-

ইংরেজিতে মাকে বলে 'মাদার', 'মাম্মি' কিংবা 'মম'। হিন্দিতেও মাকে 'মা' বলে ডাকা হয়। উর্দুতে বলা হয় 'আম্মি', জার্মানরা মাকে বলে 'মুটার' বা 'মাটার', ইতালিয়ানরা বলে 'মাডর', পর্তুগিজদের ভাষায় মাকে বলা হয় 'মাই', আলবেনিয়ানরা বলে 'মেইমি', বেলারুশরা বলে 'মাটকা', সার্বিয়ানরা বলে 'মাজকা', ডাচরা বলে 'ময়িদার' কিংবা 'ময়ার', গ্রিকরা বলে 'মানা', ক্রোয়েশিয়ায় মাকে বলা হয় 'মাতি' কিংবা 'মাজকা', ড্যানিশরা বলে 'মোর', হাওয়াইনরা বলে 'মাকুয়াহাইন', আইসল্যান্ডের মানুষ মাকে বলে 'মোয়ির', আইরিশরা বলে 'মাতাইর', নরওয়েজিয়ানরাও মাকে বলে 'মাদার', পোলিশরা বলে 'মামা' কিংবা 'মাটকা', পাঞ্জাবিরা বলে 'মাই' কিংবা 'মাতাজি', রোমানিয়ানরা বলে 'মামা' অথবা 'মাইকা', রাশিয়ানরা বলে 'মাত', তেলেগু ভাষায় মাকে বলা হয় 'আম্মা', ইউক্রেনিয়ানরা বলে 'মাতি', বসনিয়ানরা বলে 'মাজকা', বুলগেরিয়ানরাও বলে 'মাজকা', ফরাসিরা বলে 'মেরি' কিংবা 'মামাঁ', প্রাচীন গ্রিক ভাষায় বলা হতো 'মাতির', পারসিয়ানরা বলে 'মাদর' অথবা 'মামাঁ', রোমানিয়ানরা বলে 'মামা' বা 'মাইকা' ইত্যাদি।

এভাবে দেখা যায়, পৃথিবীর বেশিরভাগ ভাষায়ই মাকে সবাই 'ম' ধ্বনি উচ্চারণের মধ্য দিয়েই ডাকে। মায়ের ভালোবাসাকে যেমন দেশের সীমানা দিয়ে, জাতিভেদ দিয়ে কিংবা বর্ণ-গোত্রের বিভাজনে পৃথক করা যায় না, তেমনি বোধহয় মা ডাককেও কেউ আলাদা করতে পারেনি। মধুরতম 'মা' শব্দটি ভালোবাসার মতো সব ভাষায়ই ছড়িয়ে গেছে 'ম' ধ্বনি নিয়ে। তবে কিছু ভাষা এমনও রয়েছে যেখানে 'ম' নেই কিন্তু এসব ভাষার সংখ্যা খুবই কম। যেমন ফিলিপিনো ভাষায় মাকে বলা হয়, 'নানা' এবং তুর্কি ভাষায় বলা হয়, 'এন্নে' যেখানে ম নেই।

প্রতিবেদন: আনিকা তাবাস্‌সুম

পৃথিবীর শেষ রাস্তা

আল ওয়াসিয়া শহীদ

বন্ধুরা, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, আমরা যে রাস্তায় হাঁটি বা গাড়িতে চড়ি, তার কি কোনো শেষ আছে? পৃথিবীর শেষ রাস্তাটি কোথায় অবস্থিত– এ প্রশ্নের উত্তর অনেকেরই অজানা। কিন্তু এই পৃথিবীতে এমন একটা রাস্তা আছে, যার পর আর কোনো রাস্তাই নেই। গোলাকার কমলালেবুর মতো এই পৃথিবীর শেষ কোথায় জানো? একেক দিকে একেক দেশ বা স্থান পৃথিবীর শেষ সীমানা। পৃথিবীর শেষ মিশে গিয়েছে অসীমে।

আজ তোমাদের শোনাবো পৃথিবীর সেই অদ্ভুত আর রোমাঞ্চকর রাস্তার গল্প, যাকে বলা হয় 'পৃথিবীর শেষ রাস্তা' বা 'ই-সিক্সটি-নাইন' (E69) হাইওয়ে।

মানচিত্রে ইউরোপ মহাদেশের একেবারে ওপরের দিকে তাকালে দেখতে পাবে একটি দেশ–নরওয়ে। এই নরওয়ের উত্তর প্রান্তে রয়েছে বরফে ঘেরা এক চমৎকার দ্বীপ, নাম 'মাগেরোয়া'। এই দ্বীপের ওপর দিয়েই চলে গেছে 'ই-সিক্সটি-নাইন' হাইওয়ে। ই-৬৯ হাইওয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ১২৯ কিলোমিটার। ই-৬৯ হাইওয়ে, এটি এমন একটি রাস্তা যা উত্তর মেরুর কাছে গিয়ে শেষ হয়। এই মহাসড়কটি পৃথিবীর অন্যতম নির্জন ও অদ্ভুত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে চলে, যা একে পৃথিবীর শেষ রাস্তা হিসেবে পরিচিত করেছে।

পৃথিবীর শেষ সীমানা নিয়ে বিশ্ববাসীর কৌতূহলের কোনো শেষ নেই। বিশেষ করে অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীরা সেই স্থান দেখতে চান সরেজমিনে। সেখানে পৌঁছানো কি সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব।



এই রাস্তাটি গিয়ে মিশেছে 'নর্থ কেপ' বা উত্তর অন্তরীপে। আর এটাই হলো ইউরোপ মহাদেশের শেষ বিন্দু। এরপর আর কোনো স্থলভাগ নেই, কোনো রাস্তা নেই। আছে শুধু অফুরন্ত উত্তর মহাসাগর (Arctic Ocean) আর বরফের সাম্রাজ্য। এখান থেকে সোজা উত্তর দিকে এগিয়ে গেলে আর কোনো দেশ পড়বে না, সরাসরি পৌঁছে যাবে পৃথিবীর উত্তর মেরুতে (North Pole)!

এই রাস্তা দিয়ে একা যাওয়া নিষেধ। একা গেলেই নাকি হতে পারে বিপদ। কেন এই রাস্তায় একা যাওয়া বারণ? শুনতে খুব রোমাঞ্চকর লাগলেও, এই রাস্তায় ভ্রমণ করা কিন্তু মোটেও সহজ নয়। এখানে প্রকৃতির নিয়ম একদম আলাদা।

শীতকালে এখানকার তাপমাত্রা মাইনাসে নেমে যায়। তীব্র তুষারঝড় আর কুয়াশায় চারপাশ এতটাই অন্ধকার হয়ে যায় যে, কয়েক হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। রাস্তাটি সারা বছরই প্রায় বরফের চাদরে ঢাকা থাকে। সামান্য অসাবধান হলেই গাড়ি পিছলে যাওয়ার ভয় থাকে। শীতকালে এই রাস্তায় একা কোনো গাড়ি চালানোর অনুমতি নেই। তখন অনেকগুলো গাড়ি একসঙ্গে দলবেঁধে রওনা দেয়। আর সবার সামনে থাকে একটি বিশাল বরফ সরানোর গাড়ি (Snowplow), যা রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে এগিয়ে চলে।



এই শেষ রাস্তার আরেকটি বড়ো আকর্ষণ হলো এখানকার অদ্ভুত দিন আর রাত। উত্তর মেরুর কাছাকাছি হওয়ায় এখানে বছরের একটা বড়ো সময় সূর্য ডোবেই না! মে মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত এখানে সূর্য ডোবেই না! ঘড়িতে যখন রাত ১২টা বা ১টা বাজে, আকাশে তখনো সূর্য ঝলমল করছে! একে বলা হয় 'মধ্যরাতের সূর্য' (Midnight Sun)।

আবার ঠিক উলটো ঘটে শীতকালে। নভেম্বর থেকে জানুয়ারি–এই তিন মাস এখানে সূর্যের দেখাই মেলে না। চারপাশ ডুবে থাকে এক মায়াবী অন্ধকারে। তবে সেই অন্ধকারে আকাশে দেখা দেয় প্রকৃতির এক জাদুকরী আলো, যাকে আমরা বলি 'অরোরা বোরিয়ালিস' বা মেরুজ্যোতি। সবুজ, নীল আর বেগুনি আলোর সেই নাচ দেখলে মনে হবে কোনো রূপকথার রাজ্যে চলে এসেছ!

একটি মজার তথ্য হলো-এই ই-৬৯ রাস্তায় কিন্তু মানুষ একা নয়, মাঝে মাঝেই দলছুট বল্গা হরিণ (Reindeer) এসে রাস্তা পারাপার হয়। তখন গাড়ি থামিয়ে তাদের যাওয়ার জায়গা করে দিতে হয়!

পৃথিবীর এই শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে যখন উত্তাল সমুদ্রের দিকে তাকানো যায়, তখন মনে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ আর ভালো লাগা কাজ করে। আদিহীন, অন্তহীন সেই সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মানুষ বুঝতে পারে আমাদের এই পৃথিবীটা কত বিশাল আর সুন্দর! ভবিষ্যতে বড়ো হয়ে সুযোগ পেলে তোমরাও কি ঘুরে আসতে চাইবে পৃথিবীর এই শেষ রাস্তা থেকে? ❑

প্রাবন্ধিক

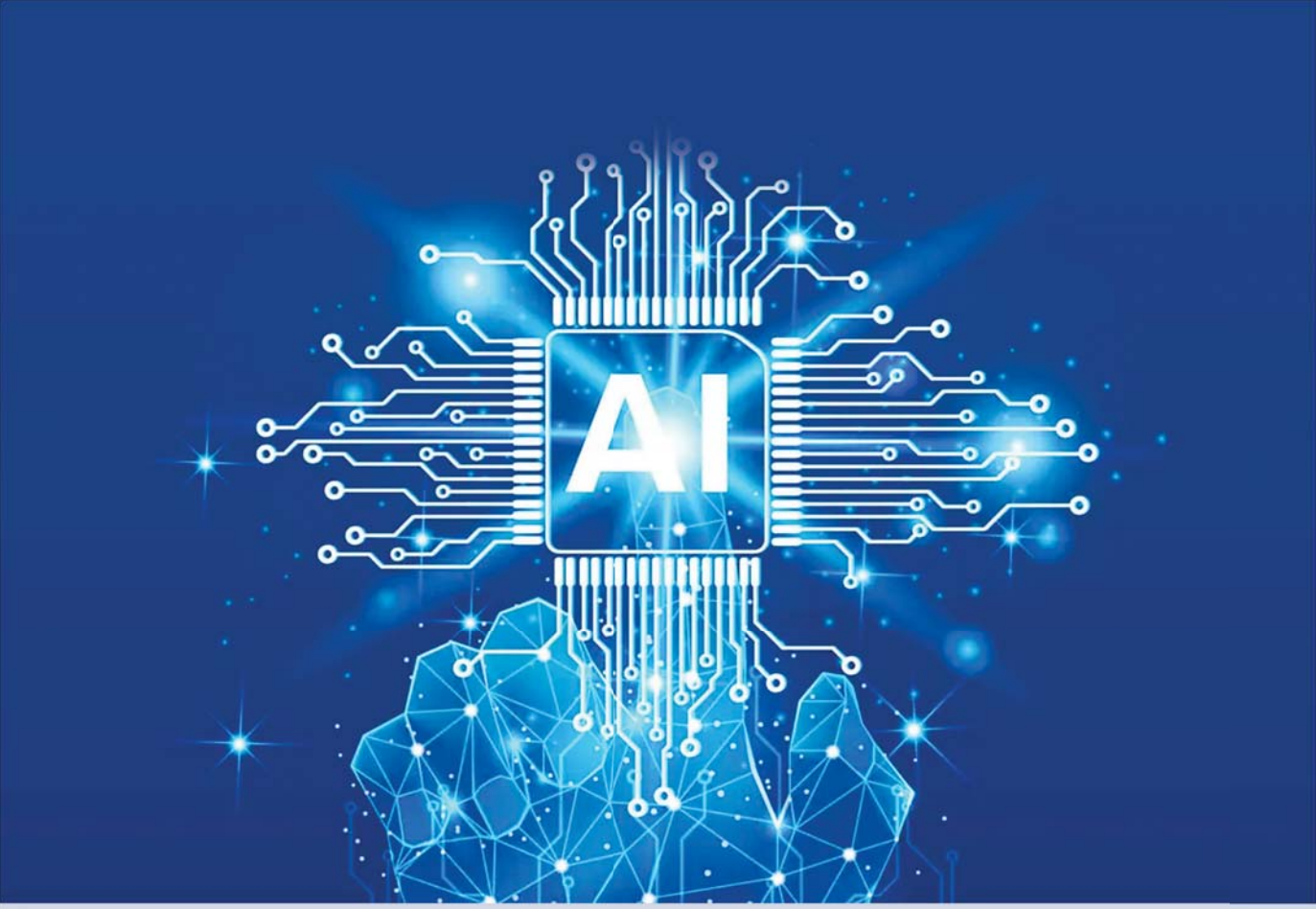

এআইতে আগামীর পথ

হুসাইন মামুন

পৃথিবী দ্রুত বদলে যাচ্ছে। প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের শেখার পদ্ধতি, কাজের ধরন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এসেছে বড়ো পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (Artificial Intelligence)। একসময় যেটিকে কেবল বিজ্ঞানের কল্পকাহিনির অংশ মনে করা হতো, আজ সেটিই বাস্তব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক প্রযুক্তিতে পরিণত হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাবসা, যোগাযোগ–প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের জন্য এআই নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে।

বিশ্বজুড়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বিভিন্ন এআইভিত্তিক শিক্ষা সহায়ক প্ল্যাটফর্ম। এর মধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত একটি টুল হলো NotebookLM। এটি শিক্ষার্থীদের নোট, PDF, ওয়েবসাইট বা গবেষণাপত্র বিশ্লেষণ করে সহজ ভাষায় সারাংশ তৈরি করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি প্রশ্নোত্তর, অডিও আলোচনা এবং দ্রুত তথ্য খুঁজে বের করার সুবিধাও রয়েছে এতে। তবে শুধু NotebookLM নয়, আরও অনেক কার্যকর এআই টুল রয়েছে, যেগুলো শিক্ষার্থীদের শেখা ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে, যেমন–

ChatGPT : শিক্ষার্থীদের জন্য একটি শক্তিশালী

এআই সহকারী হলো ChatGPT, যা শেখার প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও বোধগম্য করে তোলে। এটি ব্যবহার করে কঠিন বিষয়গুলোকে সহজ ভাষায় বোঝা যায়, রচনা বা উপস্থাপনার জন্য নতুন আইডিয়া পাওয়া যায় এবং গণিত বা বিজ্ঞানের জটিল ধারণাগুলোর ব্যাখ্যা স্পষ্টভাবে জানা সম্ভব হয়। পাশাপাশি ভাষা অনুশীলন, বিশেষ করে ইংরেজি শেখা এবং কোডিংয়ের প্রাথমিক ধারণা অর্জনের ক্ষেত্রেও এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

২. Google Gemini : এই টুল গবেষণা, তথ্য বিশ্লেষণ এবং দ্রুত সারসংক্ষেপ তৈরিতে সহায়ক। শিক্ষার্থীরা বড়ো আর্টিকেল বা ওয়েবসাইট থেকে মূল তথ্য সহজে বের করতে পারে।

Grammarly : ইংরেজি লেখালেখি উন্নত করার জন্য Grammarly একটি অত্যন্ত কার্যকর টুল। এটি ব্যাকরণ, বানান এবং বাক্য গঠনের ভুল সংশোধনে সাহায্য করে।

Canva : প্রেজেন্টেশন, পোস্টার, ইনফোগ্রাফিক এবং শিক্ষামূলক ডিজাইন তৈরিতে Canva খুবই জনপ্রিয়। এতে যুক্ত এআই ফিচারগুলো শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কাজ আরও সহজ করে তোলে।

ব্যক্তিগত শেখার সুযোগ : প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শেখার ধরণ এক নয়। কেউ দ্রুত শেখে, কেউ ধীরে; কেউ ছবি দেখে বোঝে, কেউ আবার লিখে অনুশীলন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এআই এই ভিন্নতাগুলো বুঝে ব্যক্তিভেদে শেখার অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারে। যেমন– কোনো শিক্ষার্থী গণিতে দুর্বল হলে এআই তাকে অতিরিক্ত অনুশীলন দিতে পারে। ইংরেজি উচ্চারণে সমস্যা থাকলে তা সংশোধনের পরামর্শ দিতে পারে।

জটিল বিষয় সহজভাবে বোঝানো: অনেক সময় পাঠ্যবইয়ের ভাষা শিশু-কিশোরদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। এআই কঠিন বিষয়কে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারে। গল্প, চিত্র বা ধাপে ধাপে বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি জটিল বিষয়ও সহজ হয়ে ওঠে।

ভাষা শেখায় সহায়তা : বর্তমান বিশ্বে একাধিক ভাষা জানা গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। এআইভিত্তিক ভাষা শিক্ষার টুল শিশু-কিশোরদের নতুন ভাষা শেখায় সহায়তা করতে পারে। এসব টুল উচ্চারণ ঠিক করতে সাহায্য করে, ভুল ধরিয়ে দেয়, অনুবাদ করে, কথোপকথনের অনুশীলন করায়। বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে এআই বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে। একইভাবে আরবি, ফারসি কিংবা অন্যান্য ভাষাও শেখা সহজ হচ্ছে।

সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক: অনেকে মনে করেন এআই শুধু প্রযুক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবে এটি সৃজনশীলতার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শিশু-কিশোররা এআই ব্যবহার করে গল্পের আইডিয়া তৈরি করতে পারে। কবিতা বা প্রবন্ধের কাঠামো বুঝতে পারে। ছবি আঁকার অনুপ্রেরণা পেতে পারে। বিজ্ঞান প্রজেক্টের পরিকল্পনা করতে পারে। তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো–এআই যেন চিন্তার বিকল্প না হয় বরং চিন্তার সহায়ক হয়। নিজস্ব কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দেওয়াই সবচেয়ে প্রয়োজন।

অনুশীলন ও দক্ষতা উন্নয়নে : শুধু বই পড়া নয়, নিয়মিত অনুশীলনই দক্ষতা উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। এআই এই অনুশীলনকে আরও কার্যকর ও আকর্ষণীয় করতে পারে।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া : আগে কোনো ভুল সংশোধনের জন্য শিক্ষক বা অভিভাবকের অপেক্ষা করতে হতো। এখন এআইভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম সঙ্গে সঙ্গে ভুল ধরিয়ে দিতে পারে। যেমন–
বানান ভুল, ব্যাকরণগত সমস্যা, গণনার ভুল, উচ্চারণের ত্রুটি। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ফলে শিক্ষার্থীরা দ্রুত শিখতে পারে।

নিয়মিত অনুশীলনের অভ্যাস তৈরি : এআই অনেক সময় শিক্ষাকে খেলাধুলার মতো আকর্ষণীয় করে তোলে। ছোটো ছোটো চ্যালেঞ্জ, কুইজ, পুরস্কার বা অগ্রগতির সূচক শিক্ষার্থীদের নিয়মিত অনুশীলনে উৎসাহিত করে।

এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শিশু-কিশোরদের মনোযোগ দীর্ঘ সময় ধরে রাখা অনেক সময় কঠিন হয়। এআইভিত্তিক ইন্টারেক্টিভ শেখার পদ্ধতি তাদের আগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করে।

প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন : ভবিষ্যতের পৃথিবীতে প্রযুক্তিগত দক্ষতার চাহিদা আরও বাড়বে। শিশু-কিশোররা এআই ব্যবহার করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে পারে, যেমন– প্রোগ্রামিং, গ্রাফিক ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, ডাটা বিশ্লেষণ, রোবোটিক্সের প্রাথমিক ধারণা। এসব দক্ষতা ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ভবিষ্যৎ পেশা সম্পর্কে ধারণা : বর্তমানে অনেক নতুন পেশা তৈরি হচ্ছে, যেগুলোর সঙ্গে প্রযুক্তি ও এআই সরাসরি যুক্ত। শিশু-কিশোররা এআইয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে জানতে পারে। যেমন–
সফটওয়্যার ডেভেলপার, ডাটা অ্যানালিস্ট, এআই গবেষক, সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, ডিজিটাল মার্কেটিং, কনটেন্ট ক্রিয়েটর ইত্যাদি। এআই বিভিন্ন ক্যারিয়ারের প্রয়োজনীয় দক্ষতা, শিক্ষার পথ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে।

দক্ষতা অনুযায়ী পরামর্শ : সব শিক্ষার্থীর আগ্রহ এক নয়। কেউ বিজ্ঞান ভালোবাসে, কেউ লেখালেখি, কেউ ডিজাইন, আবার কেউ প্রযুক্তি। এআই শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও দক্ষতা বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য শিক্ষার পথ বা ক্যারিয়ারের পরামর্শ দিতে পারে। এটি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সহায়তা করে।

ফ্রিল্যান্সিং ও উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ : বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ছোটো বয়স থেকেই বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করে আয় করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এআই শিশু-কিশোরদের শেখাতে পারে– কীভাবে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করতে হয়, কীভাবে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে হয়, কীভাবে ছোটো উদ্যোক্তা হওয়ার উদ্যোগ শুরু করা যায়। তবে বয়স ও নিরাপত্তার বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। অভিভাবক ও শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এসব শেখা সবচেয়ে নিরাপদ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এআই ও তরুণ প্রজন্ম: বাংলাদেশে প্রযুক্তি ব্যবহারের হার দ্রুত বাড়ছে। শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও ইন্টারনেট ও স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বাস্তবতায় শিশু-কিশোরদের প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন ও দক্ষ করে তোলা সময়ের দাবি। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম যদি সঠিকভাবে এআই শেখে এবং ব্যবহার করতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতে তারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। বিশেষ করে অনলাইন শিক্ষা, প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্যোক্তা কার্যক্রম, সফটওয়্যার ও ডিজিটাল সেবা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তরুণদের জন্য বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে।

ভবিষ্যতের প্রস্তুতি : আগামী পৃথিবীতে প্রযুক্তিগত দক্ষতা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তাই শিশু-কিশোরদের এখন থেকেই দায়িত্বশীলভাবে এআই ব্যবহার শেখা প্রয়োজন। যারা আজ সঠিকভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে শিখবে, ভবিষ্যতে তারাই গবেষণা, উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও সৃজনশীলতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকবে। তবে এর পাশাপাশি সচেতনতা, নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্বও সমানভাবে প্রয়োজন। প্রযুক্তিকে যেন মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে, প্রযুক্তি যেন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ না করে– এই ভারসাম্য বজায় রাখাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিশু-কিশোরদের হাতে যদি সঠিক দিক নির্দেশনার সঙ্গে এআই পৌঁছে দেওয়া যায়, তাহলে তারা শুধু প্রযুক্তি ব্যবহারকারী নয়, বরং ভবিষ্যতের উদ্ভাবক, গবেষক এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে। ❑

ফ্রিল্যান্সার

‘মা’ দিয়ে দেশের প্রথম শহিদমিনার

ভাষা আন্দোলন বাঙালির জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। ২১ বাঙালির কাছে শুধু মাত্র একটি সংখ্যা নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলা ভাষাভাষীর মানুষের এক শোকাবহ দিনের ক্ষতবিক্ষত স্মৃতি। যে অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে। বাঙালির সেই চেতনা ধরে রাখতে ১৯৫২ সালেই তৈরি হয়েছিল শহিদমিনার। ভাষা আন্দোলনে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই, বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির দুই দিন পর ২৩শে ফেব্রুয়ারি রাতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা তৈরি করে প্রথম শহিদমিনার।

নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত করতেই সিলেটের লিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মিত হলো, ৫২টি ভাষার সংমিশ্রণে মা শব্দের শহিদমিনার। শহিদমিনারটির উচ্চতা ৩৮ ফুট, চওড়া ৬০ ফুট। মূল অংশ কেন্দ্রীয় শহিদমিনারের আদলে। ঠিক মধ্যভাগে ‘মা’ শব্দটি বড়ো করে বাংলায় লেখা। তারপর থরে থরে আরও মা লেখা। তবে সেগুলোর ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় নানা বর্ণে। বাংলা ভাষা, জনজাতি ও আঞ্চলিক উচ্চারণে মা ডাকও আছে। সেই সঙ্গে ইংরেজি থেকে শুরু করে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভাষায় লেখা মায়ের নাম। যেন এক স্থাপত্যে সব মা। রয়েছে সংস্কৃতি, হিন্দি, চাকমা, মারমা, রাখাইন ভাষায় লেখা মা। রয়েছে বাংলা কালজয়ী কবিতার পংক্তিমালা।

মা স্থাপত্যের এই শহিদমিনার সিলেটের লিডিং ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক স্থপতি রাজন দাসের নকশায় এটি নির্মিত হচ্ছে। এ শহিদমিনারটির মূল কাঠামো নির্মাণকাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। এখন চলছে নানা ভাষা আর বর্ণমালায় মায়ের নাম বসানোর কাজ। শহিদমিনার জুড়ে শুধু মা কথার আচ্ছাদনে তৈরি হয়েছে অন্য রকম এক আকর্ষণ।



বাংলা ভাষায় মা কথার সঙ্গে 'আম্মা', 'মাই' ও 'মাইজি' আঞ্চলিক উচ্চারণের শব্দও সংগ্রহ করা হয়েছে। 'মা' শব্দ সন্ধান তৎপরতায় এ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ছাড়াও সিলেটের মণিপুরি মৈতৈ ও বিষ্ণুপ্রিয়াসহ বসবাসরত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর বর্ণমালার মা উচ্চারণের ১৪টি লিপি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে চাকমা, মারমা, ম্রো (মুরং), বম, রাখাইন, ত্রিপুরা, সাঁওতাল (অলিচিকি), ওঁরাও, সিলেটি নাগরীর সঙ্গে অহমিয়া, মিজো, গারো সম্প্রদায়ের লিপি থেকে মা শব্দ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া সংস্কৃত, ব্রাহ্মীলিপি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি, ব্রজবুলি, মালায়লাম, তেলেগু, তামিল, গজরাটি, বার্মিজ, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, রোমন ও গ্রিক ভাষায় মায়ের লিপি সংগ্রহ হয়েছে। বাংলা ভাষায় মায়ের নামের সঙ্গে থাকবে মাকে নিয়ে রচিত কালজীয় কবিতার পঙ্ক্তিও।

রাজন দাস তার এই স্থাপত্যকর্মের নাম দিয়েছেন 'রিপ্রেজেন্টেশন অব মাদার'। তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মরণে এই শহিদমিনার নির্মাণ করা হলেও এর মধ্য দিয়ে মা শব্দটি সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এত উঁচু শহিদমিনার দেশে খুব একটা নেই। এই উচ্চতা শুধু মা ও মাতৃ ভাষাকে সবার উপরে রাখার ইচ্ছে থেকে করা। সব ভাষায় মা শব্দ এখানে বসানোর একটাই লক্ষ্য, সেটি হচ্ছে পৃথিবীজুড়ে মায়ের ভাষাকে সম্মান জানানোর সঙ্গে মাকে প্রার্থনা করার মতো করে এক জায়গায় রাখা।'

এই শহিদমিনারের সামনে দাঁড়ালেই মনে পড়বে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দলনের কথা। মনে পড়বে ভাষা শহিদদের কথা। পৃথিবীর একমাত্র জাতি যারা তাদের ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাভাষীর মা ডাকের মধ্যে বাংলা শব্দের 'ম' এবং ইংরেজিতে 'এম' পাওয়া যায়। এই শহিদমিনার সব মাকে মাতৃভাষার জন্য অনন্য এক উচ্চতায় তুলে ধরে স্মরণ করবে এমনই প্রত্যাশা সবার।

প্রতিবেদন: গোলাম রহমান

মায়ের দোয়া

মো. রনি আহমেদ

মায়ের মুখের মিষ্টি হাসি
প্রাণে আনে বল
মায়ের কথায় দূরে যায়
শত কষ্টের দাবানল।

যখন আমি হোঁচট খাই
চলার পথে এসে
মা তখনও হাত বাড়িয়ে
বসে থাকেন আমার পাশে।

সেরা উপহার

মো. আব্দুল কুদ্দুছ

মা হলো জীবনের
সেরা অমূল্য উপহার
মায়ের তুলনা নেই
এই পৃথিবীতে আর।

সবার আগে মাকে
অসীম শ্রদ্ধা জানাই,
মায়ের দোয়ায় জীবনে
সুখের পথ খুঁজে পাই।

মায়ের কাছে সন্তানের ঋণ
হয় না শোধ কোনোদিন,
মায়ের ভালোবাসা
থাকে চির অমলিন।



বাবর আলীর মাকালু জয়

পর্বতারোহী বাবর আলী নিজেকে আরেক ধাপ উচ্চতায় তুলে নিলেন। পৃথিবীতে ৮ হাজার মিটার বা তার বেশি উচ্চতার পর্বত রয়েছে মোট ১৪টি। এর মধ্যে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে পাঁচটি জয় করলেন তিনি।

বাংলাদেশ সময় মে মাসের প্রথম দিন ভোর ৫টা ৪৫ মিনিটে বিশ্বের পঞ্চম উচ্চতম শৃঙ্গ মাকালুতে (৮,৪৮৫ মিটার) আরোহণ করেন বাবর আলী। নেপালের মহালাঙ্গুর হিমালে অবস্থিত এই পর্বতে এটিই কোনো বাংলাদেশি পর্বতারোহীর প্রথম সফল আরোহণ।

'এক্সপিডিশন মাকালু: দ্য ফিফথ ফ্রন্টিয়ার' শীর্ষক এই অভিযানের আয়োজন করে পর্বতারোহণ ক্লাব 'ভার্টিক্যাল ড্রিমার্স'।

'গ্রেট ব্ল্যাক ওয়ান' বা 'মহা-কালো' নামে পরিচিত মাকালু জয়ের উদ্দেশ্যে বাবর আলী গত ৭ই এপ্রিল দেশ ছাড়েন। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষে ৯ই এপ্রিল তিনি উড়ে যান টুমলিংটার, সেখান থেকে গাড়িতে পৌঁছান সেদুয়া গ্রামে। এরপর পায়ে হেঁটে ১৮ই এপ্রিল পৌঁছান উচ্চতর বেজক্যাম্পে।

উচ্চতার সঙ্গে শরীর মানিয়ে নিতে ২১শে এপ্রিল ক্যাম্প-১ এবং পরদিন ক্যাম্প-২-এ অবস্থান করেন তিনি। প্রায় ৭ হাজার মিটার উচ্চতা স্পর্শ করে পরে নেমে আসেন বেজক্যাম্পে। দ্বিতীয় দফায় ২৭শে এপ্রিল আবারো উঠে ক্যাম্প-২-এ একদিন কাটিয়ে পরদিন নেমে আসেন। এরপর শুরু হয় অনুকূল আবহাওয়ার অপেক্ষা।

৩০শে এপ্রিল আবহাওয়া অনুকূলে এলে আবার অভিযানে নামেন বাবর। সেদিনই পৌঁছে যান ৬ হাজার ৬০০ মিটার উচ্চতার ক্যাম্প-২-এ, পরদিন ওঠেন ৭ হাজার ৪০০ মিটার উচ্চতার ক্যাম্প-৩-এ। সেখান থেকে রাতেই শুরু করেন চূড়ান্ত আরোহণ। টানা ১ হাজার ১০০ মিটারেরও বেশি বিপজ্জনক খাঁড়া পথ পেরিয়ে ভোরে পৌঁছান শিখরে।

২০২২ সালে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে দুর্গম ও টেকনিক্যাল শৃঙ্গ আমা দাবলাম জয় করেন। ২০২৪ সালে একই অভিযানে জয় করেন বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট ও চতুর্থ সর্বোচ্চ শৃঙ্গ লোৎসে। গত বছর প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে আরোহণ করেন অন্নপূর্ণা-১ এবং একই বছরের সেপ্টেম্বরে কৃত্রিম অক্সিজেন ছাড়াই জয় করেন মানাসলু।

প্রতিবেদন: কামরুন নাহার কনা



মো. আবিদ, পঞ্চম শ্রেণি, ভোটমারী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, লালমনিরহাট



শিফা আক্তার, নবম শ্রেণি, আয়ান উদ্দিন মডেল হাই স্কুল, গাইবান্ধা

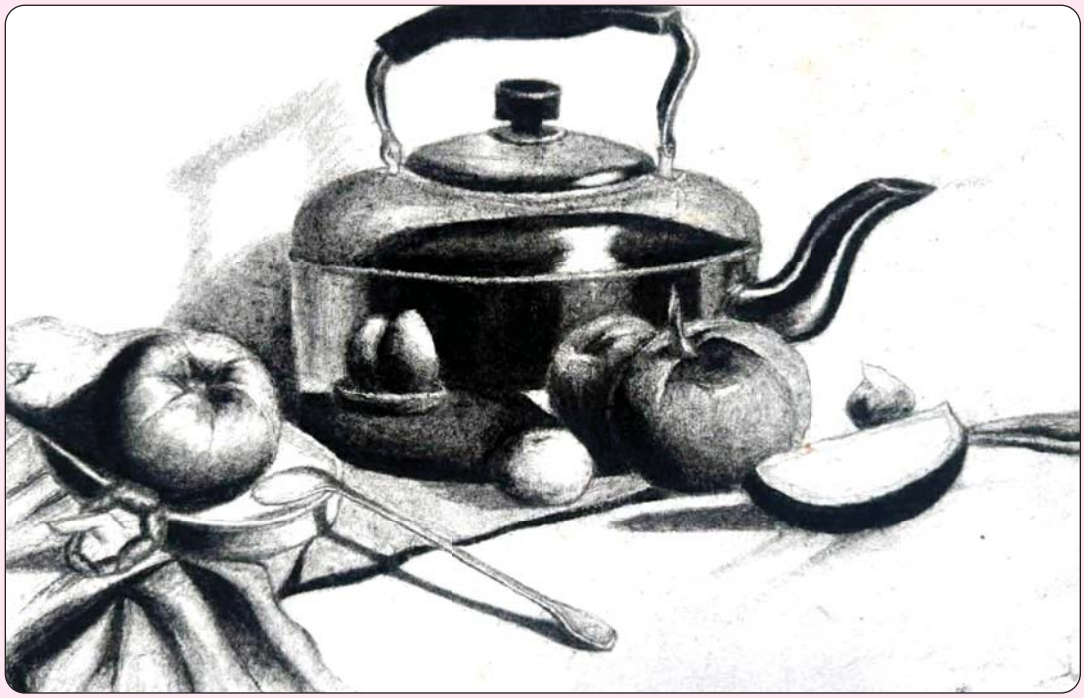

আলীশা আমরীন ইসলাম, ষষ্ঠ শ্রেণি, সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা



রুতবাহ জামান, অষ্টম শ্রেণি, কানাডিয়ান ট্রিলিনিয়াম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-50, No-11. May 2026, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

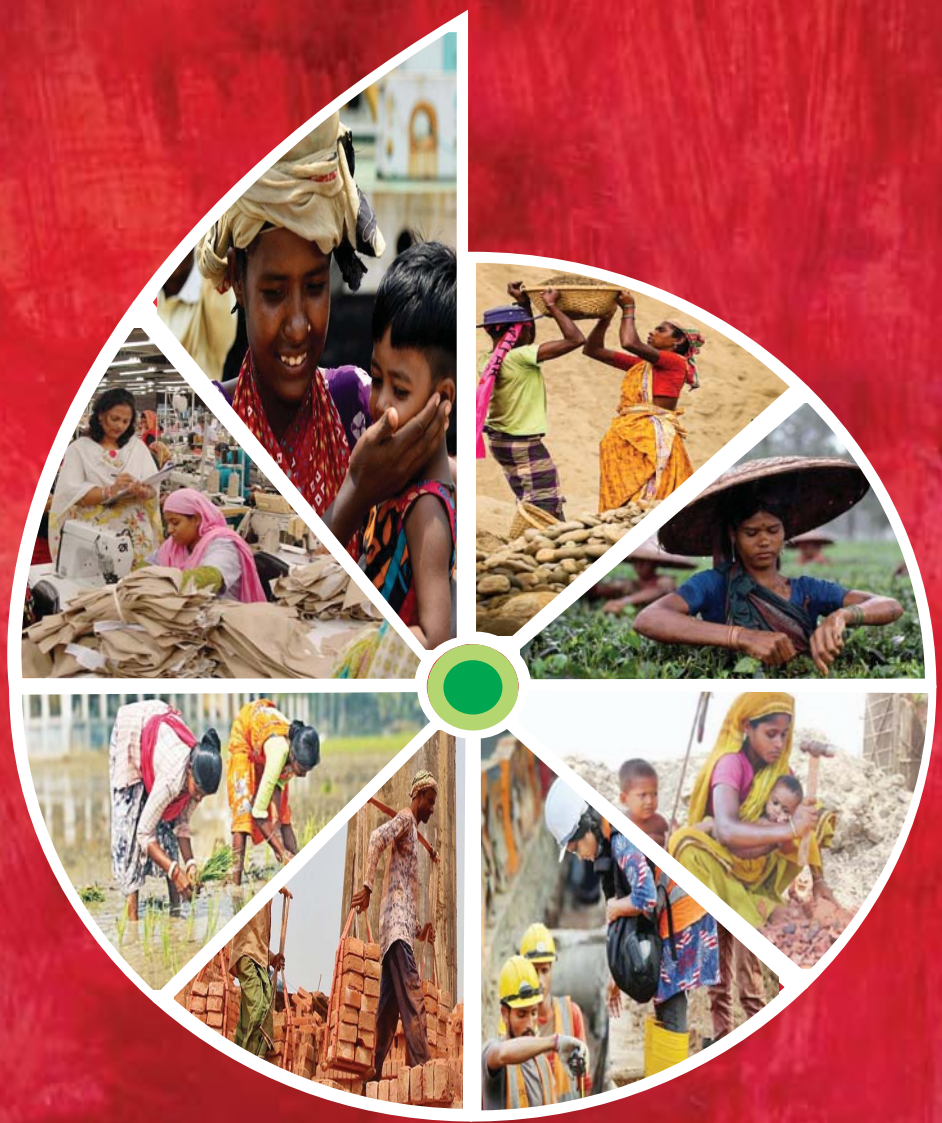

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা